ব্যঞ্জনা ও কাব্য

হরিহর মিশ্র

৬/2
56

A 4020

JANGIPUR COLLEGE
Jangipur,
Murshidabad.

রত্নসাগর গ্রন্থমালা

রত্নসাগর গ্রন্থমালা—৭

প্রথম প্রকাশ
১৩ই পৌষ ১৩৬২

প্রকাশক
দেবকুমার বসু
৭জে, পণ্ডিতিয়া রোড
কলিকাতা-২৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বর্ণলিপি
চারু খাঁ

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ডি, সি, বোস এণ্ড কোং
৬৫বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

ব্লক
প্রভাত চন্দ্র দাস
১১/১ হরিপাল লেন
কলিকাতা-৬

মুদ্রণ
ঘোষ আর্ট প্রেস
শ্যামসুন্দর ঘোষ
১৩৫এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭

পরিবেশক
গ্রন্থজগৎ, কলিকাতা

—দুই টাকা—

Jangipur College Library
4020

Acc. No 4020
Date 4/4/15
Call No 891.44103/SAR

বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন। বহুবিধ বিষয়ে নানা পুস্তক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করাই এই 'রত্নসাগর গ্রন্থমালার' উদ্দেশ্য। সকলই রত্ন যাহা মন ও জীবনকে সারবান্ করে। গ্রন্থগুলি এই কাজে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
সুশীল মজুমদার
মনোজ ভট্টাচার্য্য
দেবকুমার বসু

স্বর্গত পিতৃদেব
৺ধ্রুবানন্দ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

প্রস্তাবনা

দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সূত্রে সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে যে সব সমস্যার কথা মনে উদিত হইয়াছে, তাহার সমাধানের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থের মধ্যে করা হইয়াছে।

আমাদের দেশে কাব্যবিচার-পদ্ধতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভরত হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথ পর্য্যন্ত বহু তীক্ষ্ণধী সমালোচক কবিকর্মের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। এই সব আলংকারিকদের গ্রন্থে সাহিত্য-সংক্রান্ত বহু সমস্যার বিচার ও সমাধান দেখা যায়। কবিকৃতির প্রয়োজন ও ফল, কাব্য-প্রেরণার উৎস, কবিত্বের উপাদান, শব্দার্থের শক্তি ও সম্বন্ধ, কাব্যের স্বরূপ-বিচার, গুণ, দোষ, অলংকার, রীতি, ছন্দঃ, ধ্বনি, রস প্রভৃতি বিবিধ প্রসঙ্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্রের বিষয়বস্তু। এই সব আলোচনার মধ্যে প্রতিভাশালী আলংকারিকগণ যে অসীম সত্য-নিষ্ঠা ও অবিরাম সাধনার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় জীবন-দর্শনের মূল সুরটিই ধ্বনিত হইয়াছে। জগৎ ও জীবনের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া ভারতীয় দার্শনিকগণ যেমন বিভিন্ন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সাহিত্যের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায়ও তেমনি আম[illegible] দেশের আলংকারিকগণ বিভিন্ন মত ও পথের কথা বলিয়াছেন। ভামহ[illegible] প্রভৃতি সাহিত্য সমালোচকগণ অলংকারকেই কাব্যসৌন্দর্য্যের মূলীভূত [illegible] বলিয়া মনে করিতেন। বামন ও তাঁহার সম্প্রদায় রীতি[illegible] বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধ্বন্যালোকের গ্রন্থকার আনন্দব[illegible] —ধ্বনিই কাব্যের আত্মা। আবার যে সব আলংকারিক মাত্র র[illegible] স্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন তাঁহাদের মনের কথাটি পাই সাহিত[illegible] উক্তিতে-'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'—'রসাত্মক রচনাই কাব্য'। [illegible]

'ব্যাঞ্জনা ও কাব্য' গ্রন্থে এই সমস্ত মতের স্বরূপ বিচার ও [illegible] আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আনন্দবর্দ্ধন-প্রবর্ত্তিত ধ্ব[illegible] সাহিত্যের-স্বরূপ জিজ্ঞাসার যেরূপ যথার্থ সমাধান পাওয়া যায় অন্য ম[illegible] তাহা পাই না; সুতরাং সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠি হিসাবে ধ্বনিবা[illegible]

করিতে হইবে। অবশ্য এ কথা হইতে এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, সাহিত্য-সমালোচনার প্রসঙ্গে অলংকারবাদ ও রীতিবাদ নিতান্ত নিঃসার বা বাতিল। এই মতগুলির প্রধান মূল্য এই যে, ইহারা ধাপে ধাপে সাহিত্য-সমীক্ষার মোড় ফিরাইয়া দিয়া চূড়ান্তভাবে ধ্বনিবাদের উন্মেষে সাহায্য করিয়াছে। কাব্যজিজ্ঞাসুদের সম্মুখে এগুলি সত্যের যে এক একটি দিক্ খুলিয়া দিয়াছে—তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নহে। তাই ধ্বনিবাদের মধ্যে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত মতের একটি সুসংহত ও চূড়ান্ত রূপ দিয়া সাহিত্যের স্বরূপ-জিজ্ঞাসায় ইহাদের আংশিক উপযোগিতার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এ সমস্ত প্রসঙ্গেরই বিশদ আলোচনা বর্ত্তমান গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

এই 'ব্যঞ্জনা ও কাব্য' গ্রন্থখানি কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। খণ্ডগুলির মধ্যে আলোচ্য বিষয় বস্তুর একটি সামগ্রিক ধারাবাহিকতা থাকিলেও প্রত্যেকটি খণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। সাধারণ পাঠকের সংস্কৃতভাষায় অজ্ঞতা ও অরুচি এবং অসাধারণ পাঠকের সংখ্যাল্পতার কথা মনে রাখিয়া বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনায় সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ ও মূল সংস্কৃত উদ্ধৃতি যথাসম্ভব পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহাতে ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে সে প্রশ্ন অবান্তর। কেবল যে সব স্থানে সংস্কৃত কথাগুলি নানা কারণে অপরিহার্য্য মনে হইয়াছে মাত্র সেই সব স্থানে নিয়ম ভঙ্গ করিতে হইয়াছে। এইরূপ সমস্ত স্থলেই সংস্কৃত অংশের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যেও অপেক্ষাকৃত জটিল অংশগুলি বাদ দিয়া প্রবন্ধের প্রাঞ্জলতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা
আলোচনাগুলি কাহারও পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত বলিয়া মনে হইবে না।
নকালে এইরূপ গ্রন্থের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতার সাক্ষ্য পাঠক-
গণই দিবেন। সে বিষয়ে আমার কোন কৈফিয়ৎ নাই।

কে রাত জাগিয়া সিনেমার টিকিটের জন্য লাইন দেয় সে দেশে
র খালি থাকাটা খুব একটা চমকপ্রদ খবর না হইলেও, মানসিক
বিকারের যে নগ্ন রূপ আজকাল সমাজের সর্ব্বস্তরে অহরহঃ দেখা যায়
ন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আশঙ্কিত হইবেন। এইরূপ মনোবৃত্তির একটি
ল এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের দেশে যৌনগ্রন্থগুলির প্রকাশক যত
া যায় সাহিত্যের প্রকাশক সে তুলনায় দুর্লভ। আর সমালোচনা-
শক পাওয়ার আশা তো প্রায় বাতুলতারই সামিল। এইরূপ
বাধার জন্য 'ব্যঞ্জনা ও কাব্য' গ্রন্থখানির রচনা বহু পূর্ব্বে
ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যাপনা কার্য্যে থাকাকালে সমাপ্ত

হইলেও উহা মুদ্রিত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। অর্থ-সঙ্গতি থাকিলে গ্রন্থখানি অনেক আগেই প্রকাশিত হইত। যাই হউক, এই পুস্তক প্রকাশের জন্য 'রত্নসাগর গ্রন্থমালা' প্রকাশক-মণ্ডলীর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ., পি. আর. এস., পিঃ এইচ., ডি. মহাশয় এই গ্রন্থপ্রণয়নে যে মূল্যবান্ উপদেশ ও উৎসাহ দিয়াছেন সে জন্য তাঁহার নিকট আমি ঋণী। আর আমার যে সব স্নেহভাজন ছাত্র ও ছাত্রী এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনায় আমাকে সাহায্য করিয়াছে এই সুযোগে আমি তাহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীহরিহর মিশ্র

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ
মেদিনীপুর
দোল পূর্ণিমা, ১৩৬১

JANGIPUR COLLEGE
Jangipur,
Murshidabad.

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টির তুলনায় তত্ত্ববিচার বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যাল্পতা সহজেই চোখে পড়ে। ইতিপূর্ব্বে যে কয়খানি সমালোচনা গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নিতান্তই অপ্রচুর। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সমালোচনা সাহিত্যে এই দৈন্যের পরিধিকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংকীর্ণ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থকার অধ্যাপক শ্রীহরিহর মিশ্র, এম. এ. মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতিমান্ কৃতী ছাত্র, পরম সুধী ও সুবিদ্বান্। জটিল বিষয়কে প্রাঞ্জল ও সাধারণের সহজবোধ্য করিয়া তুলিতে তাঁহার লেখনীর ক্ষমতা অসাধারণ। সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্নরাজি জনসাধারণের নিকট এখনও অনাবিষ্কৃত হইয়া আছে তাহার উদ্ধারকার্য্য নিশ্চয়ই দুরূহ। এই কঠিন কার্য্যে বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকাগণ আমাদের সহায়ক হইলে ভবিষ্যতে এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশে আমরা উৎসাহিত হইব। এই গ্রন্থের আরও তিনটি খণ্ড প্রকাশের প্রতীক্ষায় আছে। আশা করি আমাদের এই প্রথম সম্ভার রসজ্ঞ সমাজের আশীর্ব্বাদধন্য হইবে।

সূচী-পত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব্ব ভাষণ ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

শব্দ ও তাহার শক্তি

১ অভিধা ৮

২ তাৎপর্য্য ১৭

৩ লক্ষণা ২৪

৪(ক) ব্যঞ্জনা-শাব্দী ৩৪

৪(খ) ব্যঞ্জনা-আর্থী ৪৩

তৃতীয় অধ্যায়

অলংকারবাদ ও

রীতিবাদের স্বরূপ বিচার ৫৭

১

'চতুষ্টয়ীশব্দানাং প্রবৃত্তিঃ—জাতিশব্দাঃ,
গুণশব্দাঃ, ক্রিয়াশব্দাঃ, যদৃচ্ছাশব্দাশ্চতুর্থাঃ।'

—মহাভাষ্য—

'শব্দের প্রয়োগ চারি প্রকারে হয়—জাতিশব্দ, গুণশব্দ,
ক্রিয়াশব্দ ও চতুর্থতঃ ইচ্ছাকল্পিত শব্দ।'

২

'বাক্যাৎ প্রকরণাদর্থাদ্
ঔচিত্যাদ্ দেশকালতঃ।
শব্দার্থাঃ প্রবিভজ্যন্তে
নরূপাদেব কেবলাৎ॥'

—বাক্যপদীয়—

'শব্দের কেবল রূপটির উপর তাহার অর্থ নির্ভর
করে না। বাক্য, প্রকরণ, অর্থ, ঔচিত্য, দেশ
ও কাল অনুসারে শব্দার্থের ভেদ হইয়া থাকে।'

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—পূর্ব্ব ভাষণ

কাব্য পড়ি কেন ? এই মামুলি প্রশ্নের একটা মামুলি উত্তরও বরাবরই শোনা যায় যে, কাব্যপাঠে নাকি আমরা আনন্দ পাই। কাব্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই জানেন কাব্যের আলোচনা তাঁহাদের আনন্দবোধকে জাগ্রত করে। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে কাব্যের প্রসার তো দূরের কথা তাহার সৃষ্টিই হইত না। চিরকাল ধরিয়া মানুষ তাহার সমস্ত প্রযত্ন নিজের আনন্দ লাভের অনুকূলে নিয়োজিত করিয়াছে। যখনই সে বুঝিয়াছে যে তাহার চেষ্টাবিশেষ সুখের পরিপন্থী তখনই সে তাহা ত্যাগ করিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ যে কাব্যের সৃষ্টি ও অনুশীলনে নিজেকে লিপ্ত রাখিয়াছে তাহাই প্রমাণ করে যে কাব্যচর্চ্চায় স্রষ্টা ও পাঠক আনন্দ পান।

কালিদাস বা শেক্‌স্‌পীয়ারের, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সাধারণ পাঠককে যদি প্রশ্ন করা যায়—'আপনি ও সব বই পড়েন কেন' ? তবে তিনি অনায়াসে বলিবেন—'ভাল লাগে বলিয়া'। কিন্তু তার পরও যদি আবার প্রশ্ন করা যায়—কেন ভাল লাগে ?—তাহা হইলে অবশ্যই তিনি বিব্রত বোধ করেন। তখন উত্তরটা তত সহজ বলিয়া মনে হয়না। হয় নীরব থাকা,—অথবা এলোমেলো কতকগুলি হেতু নির্দ্দেশ করা ছাড়া অনেকের পক্ষেই আর উপায়ান্তর থাকে না।

বস্তুতঃ সাহিত্যের তত্ত্বজিজ্ঞাসায় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] সাহিত্যের 'ভাল লাগাতে' কাহারও সংশয় নাই ; কিন্তু সে[illegible] লাগার' হেতু বা প্রকার কি তাহা লইয়া বিতর্ক বিচারের অন্ত [illegible] সাহিত্য অর্থযুক্ত শব্দরচনা সত্য ; কিন্তু তাই বলিয়া রচনা[illegible] সাহিত্য নহে। এখন, শব্দার্থের কোন্ নিগূঢ় মহিমা বাক্যকে [illegible] পরিণত করে তাহাই সাহিত্য সমীক্ষার মূল প্রশ্ন।

এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসার প্রথম প্রচেষ্টা আমরা দেখিতে[illegible]

রত্ন ৭-১

ভরতের নাট্য-শাস্ত্রে। এই গ্রন্থে ভরত নাট্যাভিনয় সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলিয়াছেন যে রস-সৃষ্টিই নাটকের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং যে অভিনয় যতখানি রসানুকূল তাহা ততখানি সার্থক।

এই 'রস' বস্তুটি কি? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া ভরত বলিয়াছেন,—'বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাৎ রস-নিষ্পত্তিঃ'—বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রস-নিষ্পত্তি হয়। সূত্রটির একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। মানবের চিত্তে অনাদিকাল সঞ্চিত বাসনা বা সংস্কাররূপে কতকগুলি ভাব বিদ্যমান আছে—যেমন ভালবাসা, শোক, ক্রোধ প্রভৃতি। ভরত এগুলির নাম দিয়াছেন 'স্থায়ী ভাব' এবং ইহাদের সংখ্যা আট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভরতের মতে এই আটটি স্থায়ী ভাব হইতেছে—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। নাটক-দর্শন কালে মানব হৃদয়ের এই অন্তর্লীন বাসনাগুলি উদ্বুদ্ধ হইয়া যথাক্রমে আটটি রসে পরিণত হয়—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত।

স্থায়ী ভাবের রসে পরিণতির জন্য যে সামগ্রীগুলির প্রয়োজন তাহা হইতেছে—বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব। যে নায়ক-নায়িকার ব্যবহার রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবকে উদ্বুদ্ধ করে তাহারা নাট্যে বিভাব বা কারণ; তাহাদের হাব-ভাব-কটাক্ষ প্রভৃতি কার্য্য ...গুলি অনুভাব। আবার লজ্জা, শঙ্কা, গ্লানি প্রভৃতি পরিবর্ত্তনশীল ...ভাব—যাহারা মূল স্থায়ী ভাবের প্রকাশে সাহায্য করিয়া ...হাদের নাম ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব। ভরত এরূপ ...টি ব্যভিচারী ভাবের কথা বলিয়াছেন। ইহাদের সকলের ...ত আনুকূল্যে স্থায়ী ভাব রসে পরিণত হয়। অথবা ভরতের ... বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি ... ভরত রসসূত্রের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—'নাট্যে রসগুলির আগে ব্যাখ্যা করিব। কারণ রস ছাড়া কোন অর্থই প্রবৃত্ত হয় না'১। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ভরত মাত্র শব্দার্থের মধ্যে নাট্য সৌন্দর্য্যের সন্ধান করেন নাই। তিনি নাটকের কথাগুলিকে অতিক্রম করিয়া ভাবের রাজ্যে উপনীত হইয়াছেন। এ যেন দেহকে অতিক্রম করিয়া আত্মার সন্ধান!

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ভরত তাঁহার গ্রন্থে নাট্য-তত্ত্বেরই আলোচনা করিয়াছেন। তাই বহিঃপ্রকাশ্য অনুভাব বা ব্যভিচারী ভাবের প্রতি তিনি সমধিক দৃষ্টি দিয়াছেন। অভিনয় কি প্রকারে রস সৃষ্টি করিতে পারে তাহাই তাঁহার মূল বিচার্য্য বিষয়। যদি তাঁহার মত পাঠ্য-কাব্যেও গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে উহার প্রয়োগে অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। নাটক-স্থলে বিভাব, অনুভাব প্রভৃতিকে আমরা সাক্ষাৎ পাই; কাব্যে উহারা বুদ্ধিস্থ হইয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। তা-ছাড়া, ভরতের রসসূত্রে 'সংযোগ' ও 'নিষ্পত্তি' এই দুইটি কথার অর্থ যথেষ্ট স্পষ্ট নহে। রসের আশ্রয় কে? কবি, না সহৃদয়, না নট, না অভিনেয় চরিত্র? রস কি উৎপন্ন হয়, না অনুমিত হয়? রসকে কি ভোগ করা হয়, না রস অভিব্যক্ত হয়? এ সকল প্রশ্নের সমাধানে মাত্র ভরতের সূত্রটি যথেষ্ট সহায়ক নহে। তাই পরবর্ত্তী কালে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ গড়িয়া উঠে। তাহার বিচার যথাস্থানে করা হইবে।

ভরতের পরে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া যে সব আলংকারিক মুখ্যভাবে কাব্যবিচারপদ্ধতির আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা প্রধানতঃ শব্দ ও অর্থের মধ্যে কাব্য-সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন। ভামহ, দণ্ডী, উদ্‌ভট, রুদ্রট প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই ... পথিকৃৎ। ইহারা মনে করিতেন যে অলংকারই কাব্যসৌ... হেতু। ইহাদের গ্রন্থে বহুবিচিত্র শব্দালংকার ও অর্থালং... বর্ণনা আমরা পাই। কাব্যে অলংকারের উপাদেয়তা সম্পর্কে ...

১ 'তত্র রসান্ এব তাবদ্ আদৌ অভিব্যাখ্যাস্যামঃ।
নহি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদ্ অর্থঃ প্রবর্ত্ততে।'

নাট্যশাস্ত্র—ষষ্ঠ ...

বলিয়াছেন যে, রমণীর মুখ যতই সুন্দর হউক না কেন ভূষণ-হীন হইলে তাহা যেমন শোভা পায় না তেমনি কবি-কর্ম্মের অন্য যে গুণই থাকুক না কেন নিরলঙ্কার হইলে তাহা অনুপাদেয় হইয়া থাকে।

আপাতদৃষ্টিতে কথাটি খুব সমীচীন বলিয়া মনে হইলেও পরিণামে যুক্তিসহ নহে। অলঙ্কারের যথাযথ ও পরিমিত প্রয়োগে শোভা উপচিত হয় সত্য। কিন্তু অলঙ্কারের কথা বলিলেই প্রশ্ন থাকিয়া যায়—অলঙ্কার্য্য কে? শরীর অলঙ্কার্য্য হইতে পারে না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে মৃতদেহেও অলঙ্কার শোভা সম্পাদন করিত। তা-ছাড়া এমন বাক্যও থাকিতে পারে যাহা কোন বিশেষ অলঙ্কার ব্যতিরেকেই কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। কাব্য প্রকাশে মম্মট-ভট্ট এরূপ কাব্যের একটি উদাহরণ দিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে,—

'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা,
স্তে চোন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপার-লীলাবিধৌ,
রেবা-রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥'

'যে আমার কৌমার্য্য হরণ করিয়াছিল সে-ই আমার বর হইয়াছে; সেই চৈত্ররজনীগুলিও আছে। প্রফুল্ল মালতী কুসুমের গন্ধে সুরভি কদম্ব-বনের প্রগল্ভ বায়ূ পূর্ব্বের মতই আছে। আমিও তেমনিই আছি। তথাপি রেবা নদীর তীরে বেতস বৃক্ষের তলে সুরত-[illegible] আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়।'

[illegible] কাব্যখণ্ডটির সৌন্দর্য্য নিরতিশয় চমৎকারী। কিন্তু [illegible]ন্ধান করিলে দেখা যাইবে আলঙ্কারিকদের পরিভাষা অনুযায়ী [illegible]র মধ্যে কোনও বিশিষ্ট অলঙ্কার দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। [illegible]দিন বিস্মৃত এক নিরুপম সুখস্বপ্নের স্মৃতির দ্বারা পবিত্র হইয়া [illegible]কবিবাক্য উত্তম কাব্যের সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং [illegible] উহার চরম পরিচয়। তবে যে, গোঁড়া অলঙ্কার-বাদিগণ

ইহার মধ্যেও অলঙ্কার-বিশেষ উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নেহাত-ই মতের খাতিরে।

আর, ভামহ যে যুক্তিতে বনিতার সহিত কবিতার তুলনা করিয়াছেন তাহাও খুব সুসঙ্গত নহে। যে মুখে লাবণ্য ও কান্তি আছে তাহা নিরলঙ্কার হইয়াও শোভা পায়। আবার যে মুখে স্বাভাবিক লাবণ্য ও কান্তি নাই তাহা অলঙ্কৃত হইয়াও সুন্দর হয় না। সুতরাং অলঙ্কার অপেক্ষা লাবণ্যকেই বনিতার মুখশ্রীর হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিলে অধিকতর সমীচীন হইত। অবশ্য লাবণ্যময় মুখ যথাযোগ্য অলঙ্কারে মণ্ডিত হইলে সুন্দরতর হয়—একথা সত্য। (1)
কিন্তু তাই বলিয়া অলঙ্কারকেই সেই সৌন্দর্য্যের হেতু বলা যায় না।

অলঙ্কারবাদের নিঃসারতা অন্য ভাবেও প্রমাণ করা যায়। যাঁহারা মাত্র অলঙ্কারকেই কাব্যসৌন্দর্য্যের মূল বলিয়া মনে করেন (2)
তাঁহাদের মতে কাব্যের গুণাগুণ বিচার হইবে কি করিয়া? অলঙ্কার গুণিয়া? মনে করুন 'শকুন্তলায়' পাঁচশ তিনটি অলঙ্কার আছে, আর 'মৃচ্ছকটিকে' আছে সাতশ চারটি। তাহা হইলে 'শকুন্তলা' 'মৃচ্ছকটিক' হইতে নিকৃষ্ট বলিয়া ধরিব?

বস্তুতঃ অলঙ্কারবাদের মর্য্যাদা রক্ষার আগ্রহে আলঙ্কারিকগণকে এমন সব অলঙ্কারের আবিষ্কার ও নামকরণ করিতে হইয়াছিল যাহাদের মূলে বাগ্‌ভঙ্গীর কোন উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য নাই। উদাহরণ স্বরূপ স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের নাম করা যাইতে পারে। বস্তু-স্বভাবের অবিকল বর্ণনাই স্বভাবোক্তি। আলঙ্কারিকদের দেওয়া এই নামেই প্রমাণ যে, ইহার মধ্যে অলঙ্কারের অবকাশ নাই। [illegible] স্বভাবোক্তিকে যদি অলঙ্কার না বলা যায় তাহা হইলে অলঙ্কারবাদি[illegible] মতে বহু শ্রেষ্ঠ রচনা অকাব্য হইয়া পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ 'কুমা[illegible] সম্ভব' কাব্যে অকাল-বসন্তের বর্ণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে[illegible] এই কাব্যাংশে মহাকবি কয়েকটি চিত্রের সাহায্যে বস্তু-স্বভাবের [illegible] অপূর্ব্ব বর্ণনা দিয়াছেন তাহার মধ্যে অলঙ্কারের ঝঙ্কার নাই; [illegible] বহু অলঙ্কৃত কাব্য তাহার কাছে হার মানিয়া যায়। এইসব রচ[illegible]

কাব্য-সৌন্দর্য্য যাহাতে অলঙ্কারবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় সেইজন্য দণ্ডী, ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বক্রোক্তির উপর বিশেষ জোর দিয়াও স্বভাবোক্তিকে অলঙ্কাররূপে মানিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কারণ মাত্র বক্রোক্তির পথে কাব্য-স্বরূপের সন্ধান মিলে নাই।

আবার অলঙ্কারবহুল হইয়াও বাক্য যে প্রথম শ্রেণীর কাব্য হইতে পারে না চিত্রকাব্যগুলি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতচন্দ্রের বহু রচনা এ উক্তির যথার্থ প্রমাণ করে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এত করিয়াও অলঙ্কারবাদিগণ তাঁহাদের কাব্যবিচার হইতে রসের প্রসঙ্গ একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই। দণ্ডী, ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকদের গ্রন্থে রসনিষ্পত্তির ইঙ্গিত বহুস্থলে পাওয়া যায়—বিশেষতঃ মহাকাব্যের লক্ষণে। উদ্ভট তো একেবারে স্থায়ী ভাব, বিভাব ও সঞ্চারী ভাবের উল্লেখই করিয়াছেন। কিন্তু অলঙ্কারকে তাঁহারা কাব্যসৌন্দর্য্যের হেতু বলিয়া মনে করিতেন। তাই রসকেও তাঁহারা অলঙ্কারেরই একটা প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং নাম দিয়াছেন রসবৎ-অলঙ্কার।

যাই হউক, পরবর্ত্তী কাব্যসমালোচকগণ অলঙ্কারবাদের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতার কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এ পথে সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নহে জানিয়াই তাঁহারা রীতিবাদের প্রবর্ত্তন করেন। বামন প্রথমে বলেন,—

'রীতিরাত্মা কাব্যস্য।'

'বিশিষ্ট-পদরচনা রীতিঃ।'

'বিশেষো গুণাত্মা।'

'রীতি কাব্যের আত্মা। বিশিষ্ট পদ রচনার নাম রীতি। এই শিষ্ট্য হইতেছে গুণ।'

এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বামনের রীতিবাদ শেষ ্যন্ত গুণবাদেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সে প্রসঙ্গের আলোচনা

যথাস্থানে করা হইবে। এখন এইটুকু মনে রাখিলেই চালবে যে, ইহাতেও সেই মূল প্রশ্ন অমীমাংসিতই থাকিয়া গিয়াছে; গুণগুলি কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? জীবের গুণগুলি শরীরে না থাকিয়া যেমন তাহার আত্মাতে থাকে, কাব্যের পক্ষেও তেমনি সেই একই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। বামন যাহাকে বিশিষ্ট পদরচনা বা রীতি বলিতেছেন তাহা কাব্যশরীরের অবয়বসংস্থান ছাড়া আর কিছুই নহে। গুণগুলি তাহাতে কেমন করিয়া থাকে? তাই গুণের অন্তরালে গুণীর অনুসন্ধান অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তা-ছাড়া, একটা বিশেষ ধরণের পদরচনার শৈলী বা 'ষ্টাইলকে' যাঁহারা কাব্যের আত্মা বলিয়া মনে করেন কাব্য-দর্শনে তাঁহারা নেহাতই দেহাত্মবাদী।

সুতরাং মাত্র শব্দ, অর্থ, বা তাহাদের অলঙ্কার অথবা রচনা-ভঙ্গী—ইহাদের কোনটাই পরিপূর্ণভাবে কাব্য-সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিতে পারে না। ইহাদের অতিরিক্ত কোন বস্তু অবশ্যই আছে রচনাকে কাব্যপদবীতে প্রতিষ্ঠিত করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, সেই বস্তুটির স্বরূপ কি? পরবর্ত্তী অধ্যায়-যাহা গুলিতে আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শব্দ ও তাহার শক্তি

১ অভিধা

রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' নামক কবিতায় মোক্ষদা বড় দুঃখে বলিয়াছিল,—

'শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ, দেবতা।
শোননি কি জননীর অন্তরের কথা॥'

বস্তুতঃ কথাগুলি মোক্ষদার মুখ দিয়া বাহির হইলেও নিখিল-সংকাব্যের ইহাই মর্ম্মকথা। সকল শ্রেষ্ঠ কাব্যেরই 'মুখের বাক্য' সব নহে; তাহার 'অন্তরের কথা'ই আসল কথা। আলঙ্কারিকদের ভাষায় বলিতে গেলে, কাব্যের বাচ্য অর্থ একান্ত বহিরঙ্গ; তাহার ব্যঙ্গ্য অর্থ বা ধ্বনিই তাহার আত্মা। লেখকের মতে কাব্যজিজ্ঞাসায় ইহা অপেক্ষা বড় কথা কোন দেশে কোন কালে উচ্চারিত হয় নাই। কাব্য-বিচার প্রস্থানে এই মতবাদকে 'ধ্বনিবাদ' বলা হইয়া থাকে। ইহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ও শক্তি সম্পর্কে সামান্য একটু আলোচনা আবশ্যক।

আমাদের দেশে এই শব্দার্থ-তত্ত্বের অনুশীলন অতি প্রাচীন। শাস্ত্রে বা কাব্যে সর্ব্বত্রই এই শব্দ ও অর্থের লীলা। তাই বৈয়াকরণ, নৈয়ায়িক, মীমাংসক বা আলঙ্কারিক সকলেই এই তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শব্দ উচ্চারণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে একটি অর্থ আসিয়া যে আমাদের মনে উদিত হয় তাহা সকলেরই [illegible]সিদ্ধ। প্রতি শব্দের সহিত একটি অর্থ নিয়মিত ভাবে গাঁথা [illegible]। তাহা না হইলে লোক-ব্যবহার অচল হইয়া পড়িত। [illegible] বলিতে যদি কেহ ঘোড়া, কেহ হাতী, কেহ বা অন্য কিছু [illegible] তাহা হইলে সংসার যাত্রার নির্ব্বাহ অসম্ভব হইয়া উঠিত। [illegible] এই শব্দটি উচ্চারণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে চতুষ্পাদ, শৃঙ্গ-পুচ্ছ-[illegible] যে জীবটির কথা আমাদের মনে হয় তাহাই গরু-শব্দের বাচ্য,

মুখ্য বা অভিধেয় অর্থ বলা যাইতে পারে। তাহাতেই গরু-শব্দের সঙ্কেত। শব্দ তাহার অন্তর্নিহিত যে শক্তির বলে এই বাচ্য বা মুখ্য অর্থকে বুঝাইয়া দেয় তাহাকে বলে শব্দের অভিধা-শক্তি।

শৈশবে বুদ্ধিবৃত্তির অতি সামান্য উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই শিশু তাহার চতুর্দ্দিকে উচ্চার্য্যমান শব্দের লীলা ও শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হয়। সে তাহার শিশু-সুলভ ঔৎসুক্যের দৃষ্টিতে দেখে যে, বয়স্ক ব্যক্তিগণ নানা ভাবে শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন এবং তাহার ফলে অপরে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে প্রবৃত্ত বা উহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন। যখন কোন ব্যক্তি অপরকে বলেন 'গরুটি আন' তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি চতুষ্পদ, পুচ্ছাদি-বিশিষ্ট একটি বস্তুপিণ্ড বা জীবকে লইয়া আসেন। তারপর আবার যখন তাঁহাকে বলা হয় 'গরুটিকে বাঁধ' তখন তিনি ঐ জীবটিকেই বন্ধন করেন। শিশু দেখে যে, প্রথম ব্যক্তি কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে দ্বিতীয় ব্যক্তি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; এবং উচ্চারিত শব্দ-সমূহের মধ্যে 'আন' ও 'বাঁধ' এই শব্দ দুইটির পার্থক্য থাকিলেও 'গরু' এই কথাটি উভয়ত্রই সাধারণ এবং সেই গো-পিণ্ডটিকে লইয়াই পুরুষ বিভিন্ন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। তখন তাহার একটা বোধ জন্মে যে গরু-কথাটি বলিলে ঐরূপ জীবটিকেই বুঝিতে হয়। এই প্রথম বোধে হয়তো শিশুর কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতা থাকিয়া যায়; কিন্তু পরে বহু প্রবীণ ব্যক্তির শব্দ ব্যবহার নিপুণ ভাবে লক্ষ্য করিয়া সে তাহার প্রথম বোধটিকে দৃঢ় করিয়া লয়। এমনি করিয়া জীবনের প্রথম হইতেই শব্দ যে অর্থটিকে বলে অথবা প্রতি শব্দের যাহা বাচ্য অর্থ তাহার আহরণ আরম্ভ হয়। বয়োবৃ[illegible] সঙ্গে সঙ্গে যতই বুদ্ধি-বৃত্তির ক্রমশঃ বিকাশ হইতে থাকে ততই শ[illegible] হইতে অর্থ আহরণের বিভিন্ন উপায় বালক অবলম্বন করে। এ[illegible] কথা বলিতে শিখিলেই সে পিতা মাতা প্রভৃতি সন্নিহিত আত্মী[illegible] স্বজনকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করে এবং মুখে মুখে বহু শব্দের [illegible] জানিয়া লয়। কখনও বা সাদৃশ্যের দ্বারা অর্থবোধ হয়। যে বাল[illegible] কখনও 'বাইসন' দেখে নাই সে ঐ শব্দের অর্থ জানিতে চাহিলে

বলা হয়—'বাইসন' 'মহিষের' মত। যদি মহিষটি তাহার জানা থাকে তাহা হইলে বাইসন নামক সেই অদৃষ্ট বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে তাহার একটা বোধ জন্মে। এই ভাবে ক্রমশঃ উপচিত শব্দার্থ-জ্ঞান বালককে সচেতন করিয়া তুলে যে, প্রতি শব্দেরই একটা বিশেষ অর্থ বোঝাইবার অবধারিত শক্তি আছে; অন্যথা সেই শব্দ হইতে নিয়ত-ভাবে সেই অর্থের বোধহয় কেন? তৈলের উৎপত্তি তিল হইতেই হয়; বালুকা হইতে হয় না। তেমনি করিয়া সেই শক্তি অবশ্যই শব্দে অন্তর্লীন হইয়া আছে—যাহা ব্যবহারে প্রযুক্ত হইলে বিশিষ্ট অর্থটিকে উপস্থাপিত করে। শব্দের এই শক্তিজ্ঞান না থাকিলে তাহা হইতে অর্থবোধ হইতে পারে না। শিশু প্রথমে শব্দের শক্তিজ্ঞান আহরণ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের ব্যবহার হইতে। এ শক্তির অপর নাম সঙ্কেত। অন্যান্য যে সব উপায়ে এই সঙ্কেতের বোধ হইয়া থাকে সেগুলি হইতেছে ব্যাকরণ, অভিধান, শিক্ষকের উপদেশ, পরিচিত শব্দান্তরের দ্বারা ব্যাখ্যান, প্রকরণ, দেশ ও কালের ঔচিত্য প্রভৃতি। নানার্থক শব্দস্থলে প্রকরণাদির দ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থটি ধরা পড়ে। যেমন সৈন্ধব-কথাটির অর্থ 'সিন্ধু দেশীয় ঘোটক'ও হয় আবার 'সিন্ধুজাত লবণ'ও হয়। কিন্তু ভোজনকালে কেহ যদি সৈন্ধব আনিতে বলেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি সৈন্ধব লবণের কথাই বলিতেছেন। আবার গ্রামান্তরে যাইবার জন্য কোন ব্যক্তি ঐ একই কথা উচ্চারণ করিলে বুঝিতে হইবে তিনি ঘোটকের কথা বলিতেছেন। তেমনি শীতকালে যদি কেহ বলেন—'ঐ দরজাটা একটুখানি... ...' তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বন্ধ করুন, এই বাকী টুকু বক্তার উদ্দিষ্ট। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ঐ একই কথা উচ্চারণ রিলে বুঝিতে হইবে, 'খুলে দিন' এইটুকু অভিপ্রেত। এরূপ স্থলে শিষ্ট কালই বিশিষ্ট অর্থবোধের হেতু। তাহা হইলে দেখা গেল নানা উপায়ে আমরা শব্দের অর্থটিকে চিনিয়া লই। অথবা াটিকে একটু ঘুরাইয়া বলিলে দাঁড়ায় যে, প্রতি শব্দের ান্ অর্থে সঙ্কেত বা শক্তি তাহা নানা প্রকারে আমরা

জানিয়া লই। তবেই আমাদের নিকট শব্দোচ্চারণের পর অর্থের উপস্থিতি হয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, শব্দের এই যে সঙ্কেত ইহা কোথায় গৃহীত হয়? ব্যক্তিতে, অথবা জাতিতে, অথবা উভয়ে, কিংবা অন্য কিছুতে? 'ঘট' বলিতে আমরা কি বুঝি? 'ঘট' অর্থে কি ঐ দ্রব্যটিই বুঝি, না ঘটত্ব-ধর্ম্মটি বুঝি? অথবা উভয়ই বুঝি? কিংবা অন্য কিছু বুঝি? বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নের সমাধানে সুধীগণ একমত নহেন। ইহার মীমাংসাকল্পে শব্দার্থ-তত্ত্ব-বিচারে পাঁচটি মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে,—(১) কেবল-ব্যক্তিবাদ, (২) কেবল-জাতিবাদ, (৩) জাতি-বিশিষ্ট-ব্যক্তিবাদ, (৪) অপোহ-বাদ এবং (৫) জাত্যাদি-বাদ। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তি অর্থে দ্রব্য বুঝিতে হইবে। কেবল-ব্যক্তি-বাদিগণ মনে করেন যে 'ঘট' বলিতে আমরা 'ঘট' দ্রব্যটিকেই বুঝি। 'ঘট' পিণ্ডেই ঐ শব্দের সঙ্কেত। যখন কাহাকেও 'ঘট আন' বলা যায় তখন সে ঘট দ্রব্যটিই লইয়া আসে। সে যদি 'ঘট' বলিতে 'ঘটত্ব' বুঝিত তাহা হইলে ঘট দ্রব্যটিই আনিত না। আবার যিনি শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন তিনি যদি মনে করিতেন যে ঘট মানে ঘটত্ব তাহা হইলে তাহা লইয়া আসিতে কাহাকেও নিয়োগ করিতেন না। সুতরাং লোক-ব্যবহার হইতে বুঝা যাইতেছে যে ঘট-শব্দের ঘট ব্যক্তিতেই সঙ্কেত। নব্য নৈয়ায়িকগণ এই মত পোষণ করেন।

কিন্তু মীমাংসকগণ মনে করেন যে, শব্দের সঙ্কেত ব্যক্তিতে গৃহীত হয় না—জাতিতে গৃহীত হয়। ঘট বলিতে আমরা কোন বিশেষ ঘট-দ্রব্য বুঝি না; নিখিলের সমস্ত ঘটের যে অনুগত ধর্ম্ম 'ঘটত্ব' তাহাই বুঝি। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে প্রতি ঘটে আ সঙ্কেত গ্রহণের প্রয়োজন হইত। যে ঘটটি দেখিয়া প্রথ শব্দের অর্থ বুঝিয়াছি, দেশান্তরের ঘট সেই ঘট-পিণ্ড নহে। অনন্ত ঘটে অনন্ত সঙ্কেতের কল্পনা করিতে হয়। তাছাড়া অ অনাগত ঘট, যাহা আমরা দেখিতেছি না, তাহার অর্থগ্রহণ হইয়া পড়ে। আবার অগৃহীত-সঙ্কেত 'ঘট' ও অগৃহীত-সঙ্কেত '

এই উভয় প্রকার বস্তুপিণ্ডের মধ্যে ভেদগ্রহণও দুর্ঘট হইয়া দাঁড়ায়। যে ঘটে ও যে গোরুতে আমরা সঙ্কেত জানিনা, সেখানে কোন্‌টি ঘট ও কোন্‌টি গোরু তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু অনুভব আমাদের তাহা বলে না। নিতান্ত শিশুকেও যদি একবার বলিয়া দেওয়া যায় যে, এইটিকে 'ঘট' বলে, তাহা হইলে দেখা যায় যে পরবর্ত্তী যে কোন ঘট দেখিলে বা ঘট-শব্দ শুনিলে শিশু তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারে। দ্বিতীয় ঘট দেখিয়া তাহার দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা জাগে না যে, এটা আবার কি বস্তু? তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত ঘটের যাহা সাধারণ-ধর্ম্ম 'ঘটত্ব', ঘট-শব্দের দ্বারা তাহার বোধই শিশুর হইয়া গিয়াছে। একবার একটি ঘটের অর্থ জানিয়াই সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের সমস্ত ঘটের অর্থই সে জানিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং ঘট শব্দের অর্থ 'ঘটত্ব'।

ইহার পর খুব স্বাভাবিক ভাবে যে প্রশ্ন আসে সেটি হইতেছে যে,—তাহা হইলে কি কেহ 'ঘট আন' বলিলে সেই বাক্যের অর্থ 'ঘটত্ব আন' ইহাই বুঝিতে হইবে? তাহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে, জাতির সহিত ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। জাতি সমস্ত ব্যক্তির উপরেই সমবেত হইয়া থাকে। কাজেই জাতি বোধের সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্য ভাবে ব্যক্তি আক্ষিপ্ত হয়। জাতি যেন নিজের প্রয়োজনেই ব্যক্তিকে টানিয়া লয়। সুতরাং প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ শব্দের দ্বারা জাতি বুঝাইলেও অর্থ-বশে শেষ পর্য্যন্ত সেই বোধের মধ্যে ব্যক্তি-বোধ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। সেজন্য আলাদা করিয়া ক্তি... সঙ্কেতের প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ মীমাংসকগণ এই জাতি-...দকে এতদূর প্রসারিত করিয়াছিলেন যে, সংজ্ঞা-শব্দ বা ...r nameগুলির মধ্যেও একটি জাতি আছে বলিয়া তাঁহারা ...ন করিতেন। যদি কাহারও নাম থাকে 'বেণ্টু' তাহা হইলে ঐ শব্দের সঙ্কেত 'বেণ্টু' ব্যক্তিতে না হইয়া 'বেণ্টুত্ব' জাতিতে ... কারণ শৈশব, বাল্য, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য ...তি বিভিন্ন বয়ো-ভেদে এক 'বেণ্টু' দ্রব্য থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে

বেণ্টুরূপ মাংসপিণ্ডের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। এই দৃষ্টিতে দেখিলে সে এক নহে, সে বহু এবং বহুর উপর সমবেত বেণ্টুত্ব বলিয়া একটি জাতি আছে। সর্ব্বাবস্থায়ই যে আমরা তাহাকে 'বেণ্টু' বলিয়া থাকি তাহার কারণ—'বেণ্টু' শব্দের সঙ্কেত 'বেণ্টুত্ব' জাতিতে, 'বেণ্টু' দ্রব্যে নহে। এখন প্রশ্ন আসিয়া পড়ে যে, গুণবাচক শব্দগুলির বেলায় এই জাতিশক্তিবাদ কেমন করিয়া খাটে? যেমন 'শুক্ল' একটি গুণ। এখন, শুক্ল-শব্দটি উচ্চারণ করিলে আমরা 'শুক্ল' গুণটিই বুঝিব, না 'শুক্লত্ব' জাতি বুঝিব? 'শুক্ল' তো আর অনেক নাই যে বহুর উপর 'শুক্লত্ব'-রূপ সাধারণ-ধর্ম্মটি সমবেত হইয়া থাকিবে? ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলিতে চান যে, আশ্রয়-ভেদে এক 'শুক্ল' গুণ বহু হইতে পারে। তুষারের শুভ্রতা দুগ্ধের শুভ্রতা হইতে ভিন্ন, আবার দুগ্ধের শুভ্রতা শঙ্খের শুভ্রতা হইতেও অন্যরূপ। তাই আমরা এটা শুক্ল, এটা শুক্লতর, এটা শুক্লতম ইত্যাদি প্রয়োগও করিয়া থাকি। এই যে বিভিন্ন আশ্রয়ে শুক্ল-গুণের তারতম্য ইহাই তাহার বহুত্ব এবং এই বহু শুক্লের উপর শুক্লত্ব বলিয়া একটি জাতি থাকিতে পারে। শুক্ল-শব্দের সঙ্কেত সেই জাতিতে। ঠিক একই যুক্তির বলে ক্রিয়া-শব্দগুলির বেলায়ও মীমাংসকগণ জাতিতেই সঙ্কেত বলেন। যেমন 'পাক' একটি ক্রিয়া। আমরা নানা বস্তু পাক করি, অন্ন, ব্যঞ্জন, গুড়, দুধ ইত্যাদি। আবার একই বস্তুর পাক-কালে হাঁড়ি চড়ান, হাঁড়ি নামান, ইন্ধন-যোগ ইত্যাদি বহু কাজ থাকে। অথচ এই আনুষঙ্গিক সমস্ত ক্রিয়াগুলিকে আমরা পাক-ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকি। পাচক এই বহু ক্রিয়া-সন্ততি যখন সম্পাদন করিতে থাকে তখন আমরা বলি যে সে ... করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে 'পাকত্ব' একটি ... যাহা পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন প্রকার পাকের উপরে সমবেত হইয়া থা... ...ক পাক শব্দের দ্বারা আমরা সেই সামান্য ধর্ম্মটিকেই বুঝি, যাহার... একপ্রকার পাক দেখিলেই নিখিলের সমস্ত পাক-ক্রিয়ার বোধ ... থাকে। কাজেই সঙ্কেত সর্ব্বত্রই জাতিতে গৃহীত হয়।

এখন এই উভয় মত নিপুণভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে উভয়ের মধ্যেই একটু দুর্ব্বলতা অন্তর্নিহিত হইয়া আছে। ব্যক্তি-শক্তি-বাদিগণ সঙ্কেতের মধ্যে জাতির অনুপ্রবেশ অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। আবার তেমনি জাতি-শক্তি-বাদিগণও সঙ্কেতের মধ্যে ব্যক্তির অনুপ্রবেশ দুর্ব্বার বলিয়া বোধ করিতেছেন। তাই তাঁহারা প্রধান ভাবে না হইলেও অপ্রধান ভাবে নিজ নিজ শক্তি-বাদে যথাক্রমে জাতি ও ব্যক্তির আক্ষেপ শেষ পর্য্যন্ত মানিতেছেন। জাতি-বিশিষ্ট-ব্যক্তি-শক্তিবাদে এই উভয় মতের একটা সামঞ্জস্যের সূত্র পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ এই মতের পক্ষপাতী। তাঁহারা মনে করেন যে শব্দের সঙ্কেত কেবল ব্যক্তিতে নহে, কেবল জাতিতেও নহে, কিন্তু উভয়েতেই। ঘট-শব্দের সঙ্কেত কেবল একটি ঘট পিণ্ডেও নহে অথবা কেবল 'ঘটত্ব' এই সাধারণ ধর্ম্মেও নহে। উহার সঙ্কেত ঘটত্ব-বিশিষ্ট-ঘট দ্রব্যে। সুতরাং এরূপ বোধে ব্যক্তি বা জাতি কোনটাই গৌণ নহে ; উভয়েই মুখ্য ভাবে উপস্থিত হয়। কাজেই একবার একটি ঘটের অর্থ জানিলেই নিখিলের সব ঘটেরই অর্থ জানা যায়, কারণ সেই অর্থের মধ্যে জাতিরও সঙ্কেত আছে। আবার 'ঘট আন', 'ঘট উৎপন্ন হইয়াছে', 'ঘট ভাঙ্গিয়া গেল' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিলে 'ঘটত্ব আন', 'ঘটত্ব উৎপন্ন হইয়াছে', 'ঘটত্ব ভাঙ্গিয়া গেল' ইত্যাদি বোধেরও আশঙ্কা নাই। কারণ ঘট-শব্দের সঙ্কেতের মধ্যেই ঘট-ব্যক্তি বা দ্রব্যও আছে। এসব স্থলে সেই দ্রব্যেরই বোধ হইতেছে। তাই লোকব্যবহারেও অসঙ্গতি আসিয়া পড়ে না।

কিন্তু বৌদ্ধগণ মনে করেন যে, কোন শব্দের অর্থ হইতেছে অপোহ বা অতদ্ব্যাবৃত্তি। যে মুহূর্ত্তে আমরা ঘট-শব্দ উচ্চারণ করি বা ... সে মুহূর্ত্তে যাহা কিছু অ-ঘট অর্থাৎ ঘট নহে তাহার নিষেধবোধ ...দের হয়। অন্য সমস্ত বস্তু নিষিদ্ধ হইয়া গেলে যাহা অবশেষ ...ক তাহাকেই সেই শব্দের অর্থরূপে আমরা বুঝি। বৌদ্ধদের মতে ...াগতিক বস্তু মাত্রই ক্ষণিক। কাজেই যে মুহূর্ত্তে আমরা কোন বস্তু

দেখি সেই বস্তু সেই মুহূর্ত্তেই ধ্বংস হইয়া যায় এবং তাহার স্থলে তৎসদৃশ আর একটি বস্তুর উৎপত্তি হয়! এমনি করিয়া বিনষ্ট ও উৎপন্ন বস্তুর সন্তান-ধারা চলিতেছে। সেজন্য দৃশ্যমান জগতে বস্তুসত্তার বিচ্ছেদ চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু তাই বলিয়া ক্ষণিক বস্তুর উপর নিত্য জাতি কি করিয়া থাকে? সুতরাং জাতির সিদ্ধি দুর্ঘট হইয়া পড়ে। আর ব্যক্তি তো অনন্ত। তাহাতে সঙ্কেত-গ্রহণ সম্ভবপরই নহে। নিখিলের সমস্ত ঘটকে জানা যায় না। আবার প্রতিক্ষণে সমস্ত ঘটই বিনষ্ট হইতেছে বলিয়া ঘট-জাতিরও নিত্যতায় বাধা আসিয়া পড়ে। কাজেই আমরা জানি না 'উহা কি' ; কেবল জানি 'উহা কি নহে'।

বৈয়াকরণগণ মনে করেন যে শব্দের সঙ্কেত হয় জাতিতে, অথবা গুণে, অথবা ক্রিয়ায়, অথবা দ্রব্যে গৃহীত হয়। কাজেই তাঁহাদের মতে সমস্ত শব্দকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—(১) জাতি-শব্দ, (২) গুণ-শব্দ, (৩) ক্রিয়া-শব্দ, এবং (৪) দ্রব্য-শব্দ বা সংজ্ঞা-শব্দ (Proper names)। দেখা যাইতেছে বৈয়াকরণগণ জাতি ও ব্যক্তি ছাড়াও গুণ এবং ক্রিয়াতে পৃথক্ সঙ্কেত স্বীকার করিয়াছেন। জাতিবাদিগণ একই শুক্লগুণের অথবা পাক-ক্রিয়ার আশ্রয়-ভেদে যে বহুত্ব কল্পনা করিয়া তাহাদের উপর শুক্লত্ব ও পাকত্ব ইত্যাদি জাতি স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন বৈয়াকরণগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, বস্তুতঃ শুক্ল-গুণ বা পাক-ক্রিয়া এক। তবে যে, আশ্রয়-ভেদে তাহারা বহু বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহা দ্রষ্টার কল্পনা-বিলাস মাত্র। দ্রষ্টা যদি তাঁহার নিজের মুখ জলে, দর্পণে অথবা খড়্গের পাতের মধ্যে দেখেন তাহা হইতে প্রতিবিম্ব নানা আকারের দেখাইবে। তাই বলিয়া তাঁহার নিজের মুখ এক না থাকিয়া বহু হইয়া যাইবে না। কাজেই আম... প্রতি গুণ ও ক্রিয়া এক। একের উপর জাতি থাকিতে পারে না। সুতরাং গুণ ও ক্রিয়ায় পৃথক সঙ্কেত স্বীকার করিতে হয়। আলঙ্কারিকগণ বৈয়াকরণদের সরণিই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।

সুতরাং ইঁহাদের মতে জাতি, দ্রব্য, গুণ এবং ক্রিয়া ভেদে শব্দের বাচ্য অর্থ চারি প্রকার। আমরাও তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে করি। শব্দ তাহার অন্তর্নিহিত যে শক্তির বলে এই বাচ্য অর্থটিকে বুঝাইয়া দেয় তাহাকে বলা হয় শব্দের অভিধা শক্তি। এই বাচ্য অর্থটিকে অভিধেয়ার্থ বা মুখ্যার্থও বলা হয়। শব্দ উচ্চারিত হইয়াই ভাবনান্তরের দ্বারা ব্যবহিত না হইয়া সেই অর্থটিকে বলে; সুতরাং শব্দটি বাচক এবং অর্থটি বাচ্য বা অভিধেয়। আবার আমাদের সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে মুখই যেমন প্রধান এবং অন্য অঙ্গ দৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই মুখ দৃষ্ট হইয়া যেমন ব্যক্তিকে চিনাইয়া দেয়, ঠিক একইভাবে শব্দোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্য অর্থই প্রথমে মনে উদ্ভাসিত হয় এবং তাহাই সেই শব্দের প্রথম পরিচায়ক বলিয়া সেই অর্থকে মুখ্য অর্থ বলে।

২ তাৎপর্য্য

পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় দেখা গেল যে, প্রতি শব্দ উচ্চারিত হইয়া আমাদের বুদ্ধিতে এক একটি অর্থকে উপস্থাপিত করে; এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিধার ব্যাপার শেষ হইয়া যায়। কিন্তু লোক ব্যবহারে, কাব্যে, শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই আমরা দেখি যে বিচ্ছিন্ন ভাবে আমাদের বুদ্ধিতে কতকগুলি অর্থের পৃথক্ পৃথক্ উপস্থিতিই যথেষ্ট নহে; সেগুলির পরস্পর অন্বয়ের দ্বারা একটি অখণ্ড বাক্যার্থের বোধই আমাদের অভীপ্সিত। সে বিষয়ে শব্দের অভিধা ব্যাপার আমাদের সাহায্য করিতে পারে না; কারণ, কোন শব্দের মাত্র বাচ্য অর্থটিকে উপস্থাপিত করিয়াই সে নিজেকে নিঃশেষে রিক্ত ও অবসন্ন করিয়া ফেলে। তাহার দ্বারা অর্থান্তরের বোধ আর সম্ভবপর হয় না। তাই অনেকে বাক্যার্থ বোধের জন্য তাৎপর্য্য নামক শক্তি বা বৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। যদি বলা যায় 'ঘটকে আন', তাহা হইলে প্রথমে অভিধা শক্তির দ্বারা আমাদের বুদ্ধিতে যে অর্থগুলি উপস্থাপিত হয় সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—'ঘট' শব্দের অর্থ বিশেষ-আকৃতি-বিশিষ্ট একটি ভাণ্ড, 'কে' বিভক্তির অর্থ কর্ম্মত্ব এবং 'আন' ক্রিয়ার অর্থ 'মধ্যম পুরুষ' কর্ত্তৃক আনয়ন ক্রিয়ার অনুজ্ঞা। কিন্তু এই যে বুদ্ধিস্থ বিচ্ছিন্ন অর্থ-পুঞ্জ ইহাদের সম্মেলনে শ্রোতা পুরুষের চিত্তে যদি কোন অখণ্ড বাক্যার্থবোধ জাগ্রত না হয়, তাহা হইলে তিনি বক্তার উদ্দিষ্ট ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবেন কেন? 'ঘট' বস্তুর সহিত কর্ম্মত্বের, কর্ম্মত্বের সহিত আনয়ন ক্রিয়া[illegible] আনয়ন ক্রিয়ার সহিত মধ্যমপুরুষের যে পরস্পর অন্বয়-সম্ব[illegible] তাহা সাধিত করিবে কে? লোক-ব্যবহারে ক্রিয়া-বি[illegible] প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির জন্য এরূপ অন্বয়বোধ অপরিহার্য্য। [illegible] মালাকার মালা গাঁথিতে চাহে, বহু বিচিত্র কুসুমের চয়ন-মাত্র[illegible] তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সেগুলিকে সুষ্ঠুভাবে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া একই সূত্রে গ্রথিত না করিলে কণ্ঠে পরা যাইবে

না। শব্দার্থ-কুসুম-মালিকার সেই সূত্র হইতেছে তাৎপর্য্য শক্তি, যাহার দ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন অর্থগুলি একত্র গ্রথিত হইয়া পরস্পর-সাপেক্ষ একটি অখণ্ড বোধকে উল্লসিত করে। তাহাই বাক্যার্থ।

এই বাক্যার্থ বোধের জন্য যে সামগ্রীগুলির প্রয়োজন তাহা হইতেছে আসত্তি, যোগ্যতা এবং আকাঙ্ক্ষা। আসত্তি শব্দের অর্থ সন্নিধান। যে পদার্থের সহিত যে পদার্থের অন্বয় অপেক্ষিত তাহাদের অব্যবধানে উপস্থিতিকে আসত্তি বলা হয়। বাক্যান্তর্গত পদগুলি যদি কাছাকাছি না থাকে, তাহা হইলে সেই সেই পদ দ্বারা শ্রোতার বুদ্ধিতে উপস্থাপিত পদার্থগুলিও বিপ্রকৃষ্ট ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং অখণ্ড বাক্যার্থবোধে বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই আসত্তি বা সন্নিধান দুইভাবে ব্যাহত হইতে পারে, কালের ব্যবধানে ও পদের ব্যবধানে। যদি প্রথমে আমি 'ঘট' এই শব্দের উচ্চারণ করিয়া বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে বলি 'ভাঙ্গিয়া গিয়াছে', তাহা হইলে যিনি আমার কথাগুলি শুনিবেন তাঁহার কোন বাক্যার্থবোধ হইবে না। অথচ তিনি যদি এক সঙ্গে শুনিতেন 'ঘট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে' তাহা হইলে তাঁহার একটি অখণ্ড বোধ হইত। তাহার কারণ এই যে, 'ঘট' শব্দ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বুদ্ধিতে যে 'ঘট' পদার্থটি উপস্থিত হইয়াছিল তাহা দীর্ঘকালের ব্যবধানে মুছিয়া গিয়াছে। সুতরাং পরে কোন সময়ে উচ্চারিত শব্দান্তরের দ্বারা যে অর্থ উপস্থিত হয় তাহার সহিত ব্যবহিত সেই পূর্ব্ব পদার্থের আর অন্বয় হওয়া সম্ভবপর হয় না। কাজেই, বহুক্ষণ পরে 'ভাঙ্গিয়া গিয়াছে' কথাটি শুনিয়া শ্রোতার মাত্র এইটুকু বোধ হয় যে কোন বস্তুর 'ভঙ্গ' হইয়াছে। তদতিরিক্ত অর্থ কোন জ্ঞান তাঁহার হয় না। এখানে কালের ব্যবধানই পদার্থগুলির আসত্তি বা সন্নিধানকে ব্যাহত করিয়াছে। তাই বাক্যার্থ বোধ হয় নাই।

কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, যে দুইটি ব

ততোধিক পদের অন্বয় ঈপ্সিত তাহাদের মধ্যে পদান্তর আসিয়া পড়ায় আসত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং সেইজন্য বাক্যার্থ-বোধ হইতেছে না। যদি বলা যায়, 'পর্ব্বত খেয়েছে বহ্নিমান্ রাম'— তাহা হইলে শ্রোতার কোন বাক্যার্থ-বোধ হইবে না। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এখানে বক্তব্য দুইটি পৃথক্ বাক্য, 'পর্ব্বত বহ্নিমান্'— 'রাম খেয়েছে'। সুতরাং পর্ব্বত শব্দটির কাছেই বহ্নিমান্ কথাটির থাকা উচিত। ঠিক তেমনি, 'রাম' এবং 'খেয়েছে' শব্দ দুইটির পাশাপাশি থাকা প্রয়োজন। তবেই অন্বয়বোধের সৌকর্য্য হয়। অন্যথা, অনপেক্ষিত পদান্তরের দ্বারা ব্যবহিত হইলে প্রকৃতপক্ষে যাহাদের মধ্যে অন্বয় ঈপ্সিত তাহাদের আসত্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে শ্রোতা পুরুষের বুদ্ধির বিভ্রম হয় মাত্র; কিন্তু কোন বাক্যার্থ-বোধ হয় না।

কিন্তু বাক্যার্থ-বোধের জন্য বাক্যান্তর্গত পদগুলির মাত্র আসত্তিই যথেষ্ট নহে, তাহাদের পরস্পরের প্রতি যোগ্যতা থাকাও প্রয়োজন। পদ-প্রয়োগ এমন হওয়া আবশ্যক যে, প্রতি পদের দ্বারা শ্রোতার বুদ্ধিতে উপস্থাপিত পদার্থগুলির পরস্পরের সম্বন্ধে কোন বিরোধ না থাকে। যদি কোন ব্যক্তিকে বলা যায় 'আগুনে চান করে আসুন' তাহা হইলে সেই শ্রোতা পুরুষ এই বাক্যান্তর্গত পদগুলির দ্বারা উপস্থাপিত 'অগ্নি' ও 'স্নানক্রিয়া' রূপ পদার্থদ্বয়ের অন্বয় করিতে গিয়া দেখিবেন যে পরস্পরের যোগ্যতার অভাব আছে। অগ্নির দ্বারা পাকাদি ক্রিয়া চলিতে পারে; কিন্তু অগ্নির দ্বারা স্নান অনুভব-বিরোধী। সুতরাং এরূপ বাক্য হইতে শ্রোতার অর্থ বোধ হইবে না।

আবার কেবল মাত্র আসত্তি ও যোগ্যতা থাকিলেই বিন্যস্ত পদসমূহ বাক্য হইয়া উঠিবে না। তাহাদের মধ্যে পরস্পরের প্র পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা থাকা আবশ্যক। নিরাকাঙ্ক্ষ বহু পদের স হইতে কোন বাক্যার্থবোধ হইবে না। যদি বলা যায়—মাঠ, পথ, নৌকা, আকাশ, তাহা হইলে এরূপ পদ সমষ্টি বাক্যার্থের দি হইতে দেখিলে নিরর্থকই বলিতে হইবে। কারণ এগুলি হইতে কোন

একটি অখণ্ড বোধের উল্লাস হইতেছে না। ব্যষ্টিগতভাবে দেখিলে ইহাদের প্রত্যেকটিরই অর্থ আছে। আবার প্রয়োগের দিক হইতে দেখিলে ইহাদের মধ্যে আসত্তি বা সন্নিধানও আছে, অন্ততঃ কালগত সন্নিধান ত আছেই—যেহেতু শব্দগুলি ঠিক পর পরই উচ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু নাই ইহাদের পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা। একটি পদ তাহার পরিপূর্ণ অর্থটিকে বুঝাইয়া দিবার জন্য যে পদান্তরটিকে চাহে তাহাই তাহার আকাঙ্ক্ষিত। বাক্যার্থের মধ্যে তাহার স্থান কোথায় বা কিরূপ তাহা শ্রোতা পুরুষকে বুঝাইয়া দিবার জন্য কারক চাহে ক্রিয়াকে এবং ক্রিয়া চাহে কারককে। 'মাঠ' এই শব্দটি উচ্চারণ করিলেই শ্রোতার জিজ্ঞাসা জাগে 'মাঠ' সম্বন্ধে কি করিতে হইবে? মাঠ দেখিতে হইবে; না মাঠে বিচরণ করিতে হইবে; না মাঠ হইতে ফিরিতে হইবে, না আরও কিছু? সুতরাং সেই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি যে পদান্তরের দ্বারা হইবে তাহাই 'মাঠ' শব্দের পরে প্রযোজ্য। তাহা না হইয়া যদি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘাট, পথ ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহাদের প্রয়োগ ব্যষ্টিগতভাবে সার্থক হইলেও বাক্যার্থবোধের দিক্ দিয়া একান্ত নিরর্থক।

আবার যদি বলা যায়, জল, স্নান, তাহা হইলে পদগুলির মধ্যে একটা যোগ্যতার ভাব অন্ততঃ সংশয়-রূপেও শ্রোতার মনে উদিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না। তিনি বহু সম্ভাবনাই ভাবেন। জলে স্নান কর, জলে স্নান করিও না জল খাও এবং স্নান কর ইত্যাদি বহু প্রকার সম্ভাবিত অর্থের কথা মনে আসে। কাজেই এরূপ পদসমষ্টি হইতে নিশ্চিতভাবে কোন অর্থবোধ হইতে পারে না, যতক্ষণ না যথোচিত ক্রিয়া ও কারকের সন্নিবেশ হয়। কারণ অর্থবোধের জন্য তাহাদের পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে।

অবশ্য এস্থলে সুধীদের মধ্যে একটু মতদ্বৈধ আছে। অনেকে মনে করেন যে, ক্রিয়া এবং কারকের মধ্যে যে তথাকথিত আকাঙ্ক্ষা তাহা ত আসত্তির দ্বারাই চরিতার্থ হয়। কারণ আসত্তির স্বরূপ বলিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, যাহার সহিত যাহার অন্বয় অপেক্ষিত তাহাদের অব্যবধানে উপস্থিতিই আসত্তি। সুতরাং কারকের সঙ্গে যদি ঈপ্সিত ক্রিয়ার প্রয়োগ না হইয়া পদান্তরের প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে প্রথমে আসত্তিই ত বাধিত হইয়া যায়। আর সেই আসত্তি রক্ষা করিতে হইলে কারকের সহিত ক্রিয়ার প্রয়োগ করিতে হয়। কাজেই, আকাঙ্ক্ষা মানিবার প্রয়োজন নাই। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, বস্তুতঃ ক্রিয়া ও কারকের সন্নিধান আসত্তির দ্বারাই চরিতার্থ হয়। কিন্তু প্রাতিপদিক বা ধাতু এবং তাহাদের পরবর্তী যে বিভক্তি তাহাদের সন্নিধান মাত্র আসত্তির দ্বারা চরিতার্থ হয় না। কারণ প্রাতিপ্রদিকের পর বিভক্তির অর্থটির উপস্থিতিই যথেষ্ট নহে। 'ঘটটিকে আন' এই বাক্যে ঘট-শব্দের পর কর্ম্মত্ব-বোধক দ্বিতীয়া বিভক্তি এবং আনয়নার্থক ধাতুর পর অনুজ্ঞাবোধক যে বিভক্তি তাহারা যথাক্রমে শব্দ ও ধাতুর সহিত পরস্পরের প্রতি আকাঙ্ক্ষাবশেই মিলিত হইয়া ঈপ্সিত অর্থটি প্রকাশ করিতেছে। যদি পদার্থগুলির মাত্র আসত্তিই যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে 'ঘট-কর্ম্মত্ব আনয়ন-অনুজ্ঞা' এইভাবে পদবিন্যাস করিয়াও বাক্যার্থ পাওয়া যাইত। কারণ এস্থলে 'কে' বিভক্তির যে কর্ম্মত্ব অর্থ তাহার সহিত 'ঘট' শব্দের আসত্তি ত আছেই। আবার 'আন' এই ক্রিয়ার মধ্যে যে অনুজ্ঞার্থ তাহাও ধাত্বর্থের ঠিক পরেই প্রযুক্ত হওয়ায় তাহাদের মধ্যেও আসত্তি আছে। অথচ বাক্যার্থের বোধ হইতেছে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বাক্যার্থ-বোধের জন্য বাক্যান্তর্গত পদগুলির আসত্তি, যোগ্যতা এবং আকাঙ্ক্ষা-জ্ঞানের প্রয়োজন আছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, পদগুলির আসত্তি না হয় থাকিতে পারে, কিন্তু যোগ্যতা এবং আকাঙ্ক্ষা পদে কি করিয়া থাকে? এগুলি ত পদ-ধর্ম্ম নহে। যোগ্যতা অর্থের ধর্ম্ম। যোগ্য বা অযোগ্য পদার্থ হইতে পারে, পদ নহে। তেমনি আবার আকাঙ্ক্ষা চেতনের ধর্ম্ম, তাহা পদে কি করিয়া থাকিতে পারে? চেতন পুরুষ সাকাঙ্ক্ষ বা নিরাকাঙ্ক্ষ হইতে পারে। পদ সম্পর্কে সে উক্তি তো প্রযোজ্য

Acc. No. 4020
Date 6.11.15
Call No 891.441 03/SAR
Jangipur College Library 4020

হইতে পারে না। সুতরাং পদ যোগ্যতা ও আকাঙ্ক্ষা-যুক্ত একথার অর্থ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, বস্তুতঃ যোগ্যতা অর্থের ধর্ম্ম এবং আকাঙ্ক্ষা আত্মার ধর্ম্ম হইলেও পরম্পরা-সম্পর্কে তাহা পদে আরোপিত হইয়াছে। অর্থ প্রতিপাদ্য, পদ প্রতিপাদক। অর্থ আশ্রয়ী, পদ আশ্রয়। যোগ্যতাস্থলে প্রতিপাদ্যের ধর্ম্ম প্রতিপাদকে অথবা আশ্রয়ীর ধর্ম্ম আশ্রয়ে আরোপিত হইয়াছে। তেমনি আবার আকাঙ্ক্ষা চেতনের ধর্ম্ম, তাহা শ্রোতা পুরুষেই থাকে। কিন্তু তাহা সব সময় উদ্বুদ্ধ [হয়] না। শ্রোতার কোন একটি অর্থজ্ঞান হইলে, তাহার পর অর্থান্তরের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে। কাজে অর্থই শ্রোতার মনে আকাঙ্ক্ষার জনক। আবার শব্দ অর্থের আশ্রয়। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে চেতন পুরুষ সাকাঙ্ক্ষ হইলেও পরম্পরা-সম্পর্কে শব্দও সাকাঙ্ক্ষ হইয়া পড়ে। এইভাবে যোগ্যতা ও আকাঙ্ক্ষাকে পদধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে।

এখন দেখা গেল, আসত্তি, যোগ্যতা ও আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পদ-সমষ্টি তাৎপর্য্য-শক্তির বলে পরস্পর অন্বিত হইয়া বাক্যার্থ প্রকাশ করে। পদ যেমন অভিধা-শক্তির বলে স্বীয় বাচ্যার্থকে বুঝাইয়া দেয়, বাক্য তেমনি তাৎপর্য্য শক্তির বলে বাক্যার্থের বোধ করাইয়া থাকে। মাত্র পদশক্তির দ্বারা বাক্যার্থের জ্ঞান হয় না; সেজন্য তাৎপর্য্য-শক্তি মানিতে হয়।

কিন্তু এ স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এ বিষয়েও পণ্ডিতগণ একমত নহেন। বাক্যার্থবোধের জন্য অভিধা ছাড়া তাৎপর্য্য-শক্তি স্বীকার করার প্রয়োজন আছে কিনা তাহার আলোচনা-সূত্রে দুইটি [ম]তবাদের উদ্ভব হইয়াছে,—অভিহিতান্বয়বাদ এবং অন্বিতাভিধান[বা]দ। আমরা ইতিপূর্ব্বে তাৎপর্য্য শক্তির আলোচনাকালে [যে ম]তটির উপর নির্ভর করিয়াছি তাহা অভিহিতান্বয়বাদ। নৈয়ায়িকগণ [এব]ং কুমারিল-সম্প্রদায়ের মীমাংসকগণ এই মতের পোষক। ইঁহারা মনে করেন যে পদ সকল স্ব স্ব অর্থ প্রতিপাদন করিয়া নিবৃত্ত হইয়া যায়। পুনরায় বাক্যার্থবোধে তাহাদের ব্যাপা[র]

হইতে পারে না। দুইটি বা ততোধিক পদ শ্রবণ করিলে প্রথমতঃ দুই বা তদধিক পদার্থজ্ঞান হইয়া থাকে। পরে সেই পদার্থগুলি বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবে পরস্পরের সহিত সংসৃষ্ট অর্থাৎ অন্বিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে দ্বিতীয় জ্ঞানের দ্বারা পদার্থদ্বয়ের সংসর্গ বা বিশেষ্য-বিশেষণভাব গৃহীত হয়। সুতরাং দেখা গেল, প্রথমে পদার্থগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অভিহিত হইয়া শ্রোতার বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়। তারপর তাৎপর্য্য-শক্তির বলে তাহাদের বিশেষ্য-বিশেষণভাবে অন্বয় হইয়া থাকে। সেইজন্য মতবাদটির নাম হইয়াছে অভিহিতান্বয়—অভিহিত পদার্থগুলির অন্বয়। এখানে প্রথমেই সংশয় জাগে যে, বাক্যান্তর্গত অনেকগুলি পদার্থের মধ্যে কোন্‌টি বিশেষ্য এবং কোন্‌টিই বা বিশেষণ? আমরা জানি বিশেষ্যই সর্ব্বদা প্রধান এবং বিশেষণ অপ্রধান। কাজে প্রশ্নটি দাঁড়ায় যে, বাক্যার্থবোধ কালে বাক্যান্তর্গত একাধিক পদার্থের মধ্যে কোন্‌টি শ্রোতার বুদ্ধিতে প্রধান হইয়া অবভাসিত হয়?

এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সুধী-সম্প্রদায় বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। নৈয়ায়িকগণের মতে প্রথমা বিভক্তিযুক্ত পদের অর্থই বাক্যার্থবোধ কালে প্রধানভাবে বিশেষ্যরূপে প্রতীত হয়, এবং বাক্যান্তর্গত অন্য সকল পদার্থই তাহার অনুগত হইয়া বোধের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং 'দেবদত্তঃ গচ্ছতি' বা 'দেবদত্ত যাইতেছে' এই বাক্য শ্রবণের পর শ্রোতা পুরুষের বুদ্ধিতে যে অর্থটি উদ্ভাসিত হয় তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে দাঁড়ায়, 'গমনানুকূল-কৃতিমান্ দেবদত্তঃ' বা 'গমনের অনুকূল কৃতি যাহার মধ্যে আছে তাদৃশ দেবদত্ত'। এখানে দেবদত্তই প্রধানভাবে বুদ্ধিতে ভাসে; সে-ই—বিশেষ্য। গমন-ক্রিয়া তাহার বিশেষণরূপে অনুগত হই[য়া] আছে। কিন্তু বৈয়াকরণগণ বলেন যে, ধাত্বর্থই শাব্দবোধে মু[খ্য] বিশেষ্য। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বাক্যের দ্বারা শ্রোতার যে বোধ হয় তাহার স্বরূপ হইতেছে—'দেবদত্ত কর্ত্তৃক বর্ত্তমানকালীন গমন'। এখানে গমন-ক্রিয়াটি প্রধানভাবে বোধের বিষয় হইয়াছে।

সুতরাং সেইটিই বিশেষ্য। কর্ত্তা তাহার বিশেষণরূপে অনুগত হইয়া বোধিত হইতেছে। সে যাহা হউক, অভিহিতান্বয়বাদিগণ বাক্যার্থবোধের জন্য তাৎপর্য্য-শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন।

কিন্তু অন্বিতাভিধান-বাদিগণ বাক্যার্থবোধের জন্য অভিধা-ব্যতিরিক্ত তাৎপর্য্য বলিয়া অন্য একটি শক্তি স্বীকার করেন না। প্রভাকর-মতাবলম্বী মীমাংসকগণ এই মতের পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে দুইটি পদ হইতে যে দুইটি পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহা কখনই নিরপেক্ষ ভাবে হয় না। 'ঘট [illegible]' এই বাক্য শ্রবণের পর অপরের ঘটানয়ন প্রবৃত্তি দেখিয়া শিশু যখন 'ঘট' শব্দের অর্থ বুঝিয়া লয়, তখন সে আনয়ন-ক্রিয়ার সহিত অন্বিত ঘটকেই বুঝে; ক্রিয়া-নিরপেক্ষ মাত্র 'ঘট' পদার্থ তাহার বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় না। তেমনি আনয়ন-ক্রিয়ার অর্থ সে যখন বুঝে, তখন 'ঘট'-কর্ম্মক আনয়ন-ক্রিয়াই তাহার বোধের বিষয় হয়। তাই পরবর্ত্তীকালে 'ঘট আন' এই বাক্য শ্রবণ করিলে শব্দের অভিধাশক্তির দ্বারাই তাহার বাক্যার্থের বোধ হয়; সেজন্য পৃথক্ করিয়া তাৎপর্য্য-শক্তি মানার প্রয়োজন থাকে না। কারণ প্রথমে সংকেত-গ্রহণকালেই অন্বিত পদার্থ তাহার বুদ্ধিস্থ হইয়া আছে। ভাষায় প্রয়োগ কালে সেই অন্বিতেরই অভিধান হয় মাত্র! তাই মতবাদটির নামই অন্বিতাভিধানবাদ হইয়াছে। তবে এই উভয় মতের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করিলে মনে হয়, অভিহিতান্বয়বাদই সুধী-সমাজের অধিকতর স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

শব্দ ও তাহার শক্তি
৩ লক্ষণা

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, শব্দ তাহার অভিধা শক্তির [illegible] যে অর্থটি আমাদের বুদ্ধিতে উপস্থাপিত করে তাহা সেই [illegible]ব্দের বাচ্যার্থ, এবং এই বাচ্যার্থের অপর নাম মুখ্যার্থ। এখন [illegible]শ্ন হইতেছে, শব্দের বাচ্যার্থটিকে তাহার মুখ্য বা প্রধান অর্থ

বলা হইল কেন? তবে কি শব্দের অমুখ্য কোন অর্থান্তর থাকিতে পারে, যাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া বাচ্য অর্থকে মুখ্য বা প্রধান বলা হইতেছে? যদি থাকে, তাহার স্বরূপই বা কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, শব্দের বাচ্য অর্থ ছাড়া অর্থান্তর অবশ্যই আছে, যাহা বাচ্যার্থের তুলনায় অপ্রধান। এই অর্থটির নাম লক্ষ্যার্থ এবং শব্দ তাহার অন্তর্নিহিত যে শক্তির বলে এই অর্থটিকে বুঝাইয়া দেয় তাহার নাম লক্ষণা-শক্তি। এ প্রসঙ্গে একটু আলোচনার অবকাশ আছে।

ভাষায় শব্দ-প্রয়োগ-পদ্ধতি নিপুণভাবে অনুধাবন করিলে আমরা দেখি যে, শব্দের মাত্র মুখ্য অর্থটিকে ধরিয়া থাকিলে বাক্যার্থের সঙ্গতি সব সময় হয় না। অথচ তাদৃশ প্রয়োগ ভ্রান্ত অথবা তাহা হইতে অর্থবোধ হয় না—একথা বলিলে আমাদের নিজেদের অনুভবেরই অপলাপ করা হয়। কারণ, আমরা জানি ভাষায় সে-রূপ শব্দপ্রয়োগ একটি দুটি নহে, ভূরি ভূরি পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে পরিপূর্ণ এবং সুসমঞ্জস অর্থবোধও হইয়া থাকে। উদাহরণ দ্বারা বক্তব্যটি পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা যাইতেছে। সংস্কৃতে এ সম্পর্কে যে উদাহরণ বাক্যটি খুবই প্রসিদ্ধ ও পরিচিত সেটি হইতেছে 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'। ঘোষ কথাটির অর্থ আভীর-পল্লী বা গোয়ালাপাড়া। তাহা হইলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়, 'গঙ্গাতে গোয়ালাপাড়া অবস্থিত'। আমাদের আরও পরিচিত কথায় বলিতে গেলে বলা যায়, 'গঙ্গার ওপরে তাঁর বাড়ী'। এরূপ বাক্য আমরা প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকি এবং তাহা হইতে আমাদের পরিপূর্ণ অর্থবোধও হইয়া থাকে। আমরা বুঝি, কোন ভদ্রলোকের বাড়ী গঙ্গার অত্যন্ত সন্নিকটে। কিন্তু 'গঙ্গা' কথাটি[illegible] মুখ্য বা বাচ্য অর্থ হইতেছে গঙ্গা নদীর জল-প্রবাহ। সুতরা[illegible] শব্দের মাত্র বাচ্য অর্থটি ধরিলে এরূপ বাক্য-প্রয়োগই হই[illegible] পারে না। জল-প্রবাহে গৃহের অবস্থানের যোগ্যতাই নাই। যোগ্যতা-বিরহে বাক্যের অন্বয় যে বাধিত হইয়া যায়, তাহা

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি। অথচ এরূপ বাক্য শ্রবণে শ্রোতার বাক্যার্থ জ্ঞান কখনও কুণ্ঠিত হয় না। তিনি 'গঙ্গা' শব্দের অর্থ করিয়া লন গঙ্গাতীর। তখন আর বাক্যার্থের অন্বয়ে কোন বাধা থাকে না। এই যে গঙ্গা শব্দের গঙ্গাতীর অর্থ করা হইল ইহা বাচ্য বা মুখ্য অর্থ হইতে পারে না; কারণ, গঙ্গা শব্দের সঙ্কেত তাহাতে নাই। কোন অভিধানে 'গঙ্গা' শব্দের অর্থ গঙ্গা-তীর বলিয়া লেখা নাই। অথচ দেখা যাইতেছে, গঙ্গা শব্দই এখানে সেই অর্থ বুঝাইতেছে। সুতরাং বলা যায়, 'গঙ্গা' শব্দের এই দ্বিতীয় অর্থ তাহার অমুখ্য বা অপ্রধান অর্থ—ইংরাজীতে আমরা যাহাকে বলি Secondary Sense. আমাদের দেশে শব্দার্থতত্ত্ববিদ্গণ এরূপ অর্থের নাম দিয়াছেন লক্ষ্য অর্থ বা লাক্ষণিক অর্থ; এবং শব্দ তাহার অন্তর্লীন যে শক্তির বলে এরূপ অর্থ বুঝাইতে পারিতেছে তাহার নাম দিয়াছেন লক্ষণা শক্তি। শব্দের অভিধা শক্তি যেখানে অবসন্ন, মুখ্য অর্থ যেখানে বাধিত, সেখানে লক্ষণা শক্তির উল্লাস। সুতরাং মুখ্যার্থের বাধা লক্ষণার বীজ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, মুখ্যার্থের বাধা বলিতে আমরা ঠিক কী বুঝি? 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এ স্থলে গঙ্গা শব্দের প্রবাহরূপ মুখ্যার্থ এই জন্য বাধিত যে তাহা গ্রহণ করিলে যোগ্যতার অভাবে বাক্যার্থের অন্বয় হয় না। সুতরাং এখানে মুখ্যার্থের বাধা বলিতে অন্বয়ের বাধা বুঝিব। কিন্তু এমন স্থলও আছে, যেখানে শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে অন্বয়ের কোন বাধা হয় না, অথচ বক্তা সেইরূপ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা ঠিক যে অর্থটিকে নিবেদন করিতে চান তাহা [বা]ধিত হইয়া যাইতেছে। আমরা জানি-শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্যই [হই]তেছে, বক্তা যাহা বলিতে চান তাহা প্রকাশ করা। সুতরাং [বক্তা]র ইচ্ছা বা তাৎপর্য্য যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয় সেখানেও প্রয়োজন [হই]লে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। মাত্র অন্বয়ের বাধা নাই [ব]লিয়া মুখ্য অর্থটিকে ধরিয়া থাকিলে বক্তার অভিপ্রায়ই ব্যর্থ হইয়া [যা]য়। একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে।' কেহ

অনাবৃত স্থানে দধি-ভাণ্ড রাখিয়া স্থানান্তরে যাওয়ার কালে পার্শ্ববর্ত্তী কোন ব্যক্তিকে বলিয়া গেলেন,—'দেখবেন, কাকে যেন দই না খায়।' এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই বাক্য হইতে শ্রোতা কী বুঝিবেন? তিনি যদি কাক-শব্দের মাত্র বাচ্য-অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বুঝিতে হয় যে, কাক নামক পক্ষিবিশেষ যখন দধি খাইতে আসিবে তখন তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হইবে। সুতরাং এই অর্থ অনুসারে বিড়াল, কুকুর বা অন্য পক্ষী প্রভৃতি দধি খাইতে আসিলে তাহাকে তাড়াইতে হইবে না। কিন্তু ব[ক্তা]র ইচ্ছা সেরূপ নহে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তাঁহার বলার তাৎপর্য্য এই যে কাক বা অন্য যে কোন প্রকার প্রাণী হইতে তাঁহার দধি-ভাণ্ডটি রক্ষা করিতে হইবে।

অথচ বক্তা যে 'কাক' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার বাচ্য অর্থ দ্বারা তাঁহার অভিপ্রেত অর্থটি পাওয়া যাইতেছে না। সেটিকে পাইতে হইলে লক্ষণার আশ্রয়-গ্রহণ ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এখানে বাচ্যার্থের অন্বয় কোন প্রকারে ব্যাহত হয় নাই। কারণ বাক্যান্তর্গত পদগুলির মধ্যে স্বগত কোন বিরোধ নাই—যাহা আছে 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—এই স্থলে। জলস্রোতে জননিবাস অযোগ্যতার দ্বারা বাধিত; কিন্তু কাক হইতে দধি রক্ষার মধ্যে সে জাতীয় অযোগ্যতাদি কোন বাধা নাই। সুতরাং এস্থলে অন্বয়ের বাধা লক্ষণার বীজ নহে; বক্তার তাৎপর্য্যের বা অভিপ্রায়ের বাধা হইতেছে বলিয়াই লক্ষণা স্বীকার কারতে হইতেছে। যদি মাত্র অন্বয়ের বাধাই লক্ষণা স্বীকারের হেতু হইত তাহা হইলে এস্থলে লক্ষণার কোন যৌক্তিকতা থাকিত না। বস্তুতঃ অন্বয়ের বাধা ন[া] বলিয়া তাৎপর্য্যের বাধাই লক্ষণার বীজ বলিয়া ধরা উচিত। ক[া]রণ অন্বয়ের বাধার অপসারণের জন্যই যদি লক্ষণার প্রয়োজন হ[ইত] তাহা হইলে 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এস্থলে 'গঙ্গা' পদে লক্ষণা না ক[রিয়া] ঘোষ পদে লক্ষণা করিলেও অন্বয়ের সঙ্গতির কোন বিঘ্ন হইত ন[া]। ঘোষ শব্দের যদি মৎস্যে লক্ষণা করা যায় তাহা হইলে 'গঙ্গায়া[ং]

মৎস্যঃ' অর্থাৎ 'গঙ্গায় মাছ থাকে' এইরূপ বাক্য দাঁড়ায়। তখন অন্ততঃ অন্বয়ের দিক্ দিয়া কোন বাধা থাকে না। কিন্তু বক্তার তাৎপর্য্য তাহা নহে। তাই গঙ্গা-পদের তীরে লক্ষণাই সমীচীন বলিয়া ধরা হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যেখানে শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে বক্তার ইচ্ছার বা তাৎপর্য্যের বাধা উপস্থিত হয় সেইখানে লক্ষণা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এ সম্বন্ধে আরও একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বোঝা যাইবে। স্থানে ব্রাহ্মণভোজন কালে কেহ বলিলেন—'লাঠিগুলিকে ভিতরে লইয়া আইস'। তাহাতে বাক্যার্থের অন্বয়ের কোন বাধা হয় না; কারণ লাঠিগুলির আনয়ন-ক্রিয়ায় যোগ্যতা আছে। কিন্তু বক্তার ইচ্ছা অন্যরূপ। তিনি লাঠিধারী ব্রাহ্মণদিগকে ভিতরে লইয়া আসিতে বলিতেছেন। তাঁহার সেই অভিপ্রায়টি লাঠি শব্দের মুখ্যার্থের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে না। অথচ বাক্য প্রয়োগের একমাত্র উদ্দেশ্যই হইতেছে, বক্তার অভিপ্রায়-জ্ঞাপন। তাই লাঠি শব্দে লক্ষণা করিয়া 'লাঠিধারী পুরুষ' এই অর্থ বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বের আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, কোন শব্দের মুখ্যার্থ যখন বক্তার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে গিয়া কুণ্ঠিত হয়, তখন সেই শব্দ তাহার অন্তর্নিহিত লক্ষণা শক্তির বলে অন্য একটি অর্থ উপস্থাপিত করিয়া সমস্যার সমাধান করে। এই দ্বিতীয় অর্থটিকে আমরা লাক্ষণিক অর্থ বলিয়া থাকি এবং সেইরূপ শব্দকে লক্ষক শব্দ বলি। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায়, এই লাক্ষণিক অর্থটির স্বরূপ কী? দি মুখ্যার্থ বাধিত হইয়া বাতিল হইয়া গেল, তবে কি যে কোন র অর্থকে লক্ষ্য করিয়া লক্ষক শব্দ প্রয়োগ করা চলিবে? ন যদি বলেন যে, তাঁহার সেইরূপ অর্থেই তাৎপর্য্য, তবে কি র যদৃচ্ছা-কল্পিত অর্থই লাক্ষণিক অর্থ বলিয়া গৃহীত হইবে? হা হইলে তো ভাষার প্রয়োগবিধিতে ও অর্থ-নির্ণয়ে বিপ্লবের ন্ত থাকিবে না। কেহ বাক্য প্রয়োগ করিলেন, 'আমি গঙ্গায়

বাস করি' এবং তাহা হইতে লক্ষণার বলে অর্থ করিতে চাহিলেন, 'আমি মাতুলালয় বাস করি', বা 'নগরে বাস করি', অথবা 'পর্ব্বতে বাস করি' ইত্যাদি। এমনি করিয়া এক 'গঙ্গা' শব্দের লক্ষ্যার্থরূপে যে-কোন অর্থ বক্তার ইচ্ছানুযায়ী উপস্থাপিত হইতে পারে। তাদৃশ যে-কোন প্রকার কল্পিত অর্থকে প্রকৃত লক্ষ্যার্থ বলা যাইবে কিনা তাহাই বিচার্য্য বিষয়। বস্তুতঃ লক্ষণার স্থলে এইরূপ যথেচ্ছ প্রয়োগ যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেজন্য কতকগুলি বিধি মানিয়া চলিতে হয়। প্রথমেই দেখিতে হইবে যে লক্ষ্যার্থটি যেন বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হয়। বাচ্যার্থ বাধিত হইল বলিয়া তাহাকে একেবারে বাদ দিয়া তাহার সহিত নিঃসম্পর্কিত কোন অর্থকে লক্ষ্যার্থরূপে গ্রহণ করা চলিবে না। তাই গঙ্গা শব্দে লক্ষণা করিয়া 'গঙ্গার সমীপবর্ত্তী তীর' পাওয়া যাইতে পারে। কারণ গঙ্গার সহিত তাহার তীরের সামীপ্য-সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু মাতুলালয়, নগর, পর্ব্বত ইত্যাদি অর্থ গঙ্গা অর্থের সহিত সম্পর্ক-হীন; তাই তাদৃশ অর্থ-নিচয় গঙ্গা শব্দের লক্ষ্যার্থ হইতে পারে না। তেমনি 'লাঠিদের নিয়ে এস' বলিলে লাঠি শব্দের লাক্ষণিক অর্থে লাঠিধারী পুরুষকে বুঝিতে হইবে। কারণ লাঠির সহিত লাঠিধারী পুরুষের সাহচর্য্য-সম্বন্ধ আছে। আর যদি বাচ্যার্থের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ-হীন অর্থও লক্ষ্যার্থরূপে গৃহীত হইতে পারিত তাহা হইলে এই বাক্যের অর্থ বক্তার ইচ্ছানুযায়ী কখন 'আসনগুলি লইয়া আইস' কখন 'বালতিগুলি লইয়া আইস', কখনও বা 'জল লইয়া আইস' ইত্যাদি নানা বিচিত্র-রূপ পরিগ্রহ করিত। তাহা হইলে কোন লক্ষক পদ হইতে প্রকৃত অর্থগ্রহণ দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইত। সেইজন্য বলা হইয়াছে যে লক্ষ্যার্থ সবসময় মুখ্যার্থের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত হইয়া থাকিবে।

এখন দেখা গেল, মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত একটি অর্থ লক্ষ্যা রূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু জগতের বস্তু নিচয়ের মধ্যে সম্বন্ধে অন্ত নাই। কোন বস্তু অন্য যে কোন বস্তুর সহিত কোন না কো

প্রকারে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া আছে। তাই সংশয় থাকিয়া যায়, লক্ষণা স্থলে লক্ষ্যার্থটি মুখ্যার্থের সহিত কিরূপ সম্বন্ধযুক্ত হইবে? মহর্ষি গৌতম তাঁহার ন্যায়-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি সূত্রে এইরূপ দশটি সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে শাস্ত্রান্তরে এই সম্বন্ধের সংখ্যা পাঁচ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, সম্বন্ধগুলির সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও এবিষয়ে সকলেই একমত যে লক্ষ্যার্থটি যতদূর সম্ভব বাচ্যার্থের আসন্ন হইবে। বাচ্যার্থ যখন বক্তার তাৎপর্য্য-বো[ধে] অক্ষম হয় তখন উহা নিজের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কাছাকাছি একটি অর্থ খোঁজে। সুতরাং বাচ্যার্থ সবসময় লক্ষ্যার্থের উপজীব্য। বাচ্যার্থরূপ ভূমির উপর লক্ষ্যার্থ দাঁড়াইয়া থাকে। এই জন্যে লক্ষণাকে অভিধার পুচ্ছ বলিয়া বলা হইয়াছে। উহা যেন অভিধেয়ার্থরূপ প্রাণীর পুচ্ছস্বরূপ—অপ্রধান হইলেও তাহার সহিত সম্বন্ধ। প্রাণীটিকে বাদ দিয়া যেমন শুধু তাহার পুচ্ছের কথা ভাবা যায় না, তেমনি অভিধাকে বাদ দিয়া লক্ষণার কথাও ভাবা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, কোথাও যেন লক্ষ্যার্থটি বাচ্যার্থ হইতে অতি দূরবর্ত্তী না হইয়া পড়ে। কারণ তাহা হইলে শ্রোতার পক্ষে অর্থ গ্রহণ দুষ্কর হইয়া পড়ে এবং শব্দার্থের প্রয়োগ পদ্ধতি ব্যাকুল হয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, লক্ষ্যার্থটিকে পাইতে হইলে যদি এত বিধিনিষেধের বন্ধন মানিয়া চলিতে হয় তবে সেইরূপ শব্দ প্রয়োগের বা প্রয়োজন কি? লক্ষণার দ্বারা যে অর্থটি পাইব সেই অর্থের বাচক শব্দটি স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিলেই তো সব জটিলতার অবসান হয়। তবে লক্ষক শব্দ প্রয়োগের যৌক্তিকতা কোথায়? 'গঙ্গাতে ঘোষ পল্লী' এই বাক্যে গঙ্গা শব্দে লক্ষণা করিয়া আমরা 'গঙ্গাতীর' [এ]ই লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করি। কিন্তু যদি 'গঙ্গাতীরে ঘোষ পল্লী' বলি [ত]াহা হইলে আর লক্ষণার আশ্রয় লইতে হয় না। বাচ্যার্থই তখন বক্তার অভিপ্রেত অর্থ হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি 'গঙ্গাতীরে' না বলিয়া 'গঙ্গাতে' এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করা হয় কেন?

ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এইরূপ শব্দ প্রয়োগের দুইটি হেতু আছে। প্রথমটি হইতেছে রূঢ়ি বা প্রসিদ্ধি। ভাষার প্রয়োগ-বিধি বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে অনেক শব্দ তাহাদের বাচ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া তৎসম্বন্ধ অর্থান্তরে এত বহুলভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে তাহাদের এই দ্বিতীয় অর্থটিকে আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভাষার বহুল প্রয়োগ বা প্রসিদ্ধি এইরূপ অর্থের স্বীকৃতি জানাইয়া দেয়। তাহার অপলাপ সম্ভবপর হয় না। যেমন 'অনুকূল' শব্দ। কূল শব্দের অর্থ তীর। তীররেখা যেভাবে গিয়াছে নদীস্রোত যখন তাহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া ঠিক সেই ভাবেই প্রবাহিত হয়, তখন সেইরূপ স্রোতকে 'অনুকূল' বলা যাইতে পারে। আবার স্রোত যখন তীররেখার বিরোধী হইয়া তাহা ভাঙ্গিতে উদ্যত হয়, তখন উহাকে বলা যায় 'প্রতিকূল'। কিন্তু ভাষায় প্রয়োগপদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখিতে পাই যে এই শব্দ দুইটি আপন আপন মুখ্যার্থকে অন্তরালে রাখিয়া অর্থান্তর গ্রহণ করিয়াছে। আমরা বলি 'সত্যভাষণ ধর্ম্মের অনুকূল'। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এস্থলে অনুকূল শব্দ মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হইতে পারে না। তাই ইহার লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিতে হয়। নদীর তীর এবং স্রোত একমুখীন হইলে যেমন পরস্পরের পোষক হইয়া থাকে সত্যভাষণ ও ধর্ম্ম সেইরূপ পরস্পরের পোষক—লক্ষ্যার্থটি এইরূপ দাঁড়ায়। এইভাবে অনুলোম, প্রতিলোম প্রভৃতি শব্দও রূঢ়ি লক্ষণার উদাহরণ। 'বাংলার দুঃখের অন্ত নাই', 'আমেরিকা অধ্যবসায়ী' 'জার্ম্মানী রণক্লান্ত' ইত্যাদি বাক্য ভাষায় আমরা প্রায়ই প্রয়োগ করিয়া থাকি। অথচ আমরা জানি যে সুখ, দুঃখ, অধ্যবসায়, ক্লান্তি, প্রভৃতি চেতনেরই ধর্ম্ম। সুতরাং কোন দেশকে সেইরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট ব[লা] যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া এই সব প্রয়োগকে ভ্রান্তও ব[লা] চলে না, কারণ ব্যবহারে প্রসিদ্ধিবশে এসব শব্দ হইতে বিলক্ষণ অর্থবোধ হইয়া থাকে। সেই সেই দেশ অর্থে আমরা দেশের অধিবাসীকে বুঝিয়া থাকি। কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে এসব

স্থলে মুখ্যার্থ বাধিত হইলেও প্রসিদ্ধিবশে রূঢ়ি-লক্ষণা অর্থবো করাইতেছে। স্থূল কথা, এইরূপ প্রয়োগে ভাষার ব্যবহারে রূঢ়ি বা প্রসিদ্ধিই লক্ষণার হেতু।

লক্ষণা প্রয়োগের দ্বিতীয় হেতু হইতেছে—প্রয়োজন বা ফল এইরূপ লক্ষণাকে 'প্রয়োজন-লক্ষণা' বা 'ফল-লক্ষণা' বলা হইয় থাকে। উদাহরণস্বরূপ 'গঙ্গাতে ঘোষ পল্লী' এই বাক্যটি উল্লে করা যাইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, 'গঙ্গায় ঘোষ' বলিলে লক্ষণার দ্বারা যে অর্থের বোধ হয় 'গঙ্গাতীরে ঘোষ' বলিলেও অভিধার দ্বারা ঠিক সেই অর্থেরই বোধ হইয়া থাকে কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। নিপুণভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে প্রথম বাক্যে দ্বিতীয় বাক্য অপেক্ষা বিশিষ্টতর অর্থ পাওয় যায়। সেই বৈশিষ্ট্যটুকু হইতেছে—ঘোষপল্লী গঙ্গার এত সন্নিক যে নদীর শৈত্য এবং পবিত্রতা ঘোষগণ সমধিক উপভোগ করি থাকে। 'গঙ্গাতীরে' না বলিয়া 'গঙ্গাতেই' বলায় অধিকত সামীপ্যের বোধ হয়, এবং অধিকতর সামীপ্য হেতু অধিকতর শীত এবং পবিত্রতার বোধ জাগে। এটি লক্ষণার ফল বলিতে হইবে সুতরাং এইরূপ স্থলে লক্ষণার প্রয়োগ উদ্দেশ্যমূলক। যদি বক্তা এ ফলটুকু পাইতে না চান—অর্থাৎ শৈত্য, পবিত্রতাদির আধি বোঝান তাঁহার যদি অভিপ্রেত না হয় তাহা হইলে তিনি 'গঙ্গাতীর এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে পারেন। আবার আমরা কো তেজস্বী বালককে লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় বলি, 'ছেলেটি সিংহ' এ স্থলে একথা বলা যুক্তিসহ নহে যে 'বালকটি সিংহের মত তেজস্ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলেও আমরা সমান অর্থই পাইতা কারণ প্রথম বাক্যে তাহার পরাক্রম ও তেজস্বিতার যতখা আধিক্য বোধিত হইতেছে দ্বিতীয় বাক্যে তাহা পাওয়া যাইতেছে না সেই পরাক্রমাতিশয্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই বক্তা এইরূপ লক্ষক ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে পারা যায়না যে এস্থ লক্ষণা প্রয়োগ না করিলেও চলিত; কারণ বক্তার যাহা মনো

অভিপ্রায় তাহা মাত্র অভিধা নিঃশেষে নিবেদন করিতে পারিত না। কাজেই সেইটুকুই লক্ষণার প্রয়োজন বা ফল। এমনিভাবে ফল-লক্ষণার বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, লক্ষণার সামগ্রী তিনটি—মুখ্যার্থের বাধা, মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ এবং রূঢ়ি অথবা প্রয়োজন। প্রথমেই দেখিতে হইবে মুখ্যার্থের বাধা হইয়াছে কিনা। যদি মুখ্যার্থ নিজেই বক্তার অভিপ্রায় নিঃশেষে প্রকাশ করিতে পারে, তাহা হইলে লক্ষণা স্বীকার করা উচিত নয়; কারণ মুখ্যার্থই শব্দের স্বাভাবিক অর্থ এবং তাহাই সর্ব্বথা উপাদেয়। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, লক্ষ্যার্থরূপে যে অর্থটিকে গ্রহণ করা হইতেছে মুখ্যার্থের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কিনা। এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি না থাকিলে অনেক সময় কোন শব্দের লক্ষ্যার্থ একটি উদ্ভট কল্পনায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। তৃতীয় বিচার্য্য বিষয় হইতেছে, লক্ষণার দ্বারা অর্থের দিক্ দিয়া কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে কিনা অথবা ভাষার ব্যবহারে সেইরূপ লক্ষক শব্দ প্রয়োগের প্রসিদ্ধি আছে কিনা। দেখা যাইতেছে, আমাদের দেশে শব্দার্থতত্ত্ববিদ্গণ লক্ষণা প্রয়োগে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। কারণ শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ে শব্দ এবং অর্থই একমাত্র উপায়। সেই শব্দার্থের প্রয়োগ যদি অসঙ্গত ভাবে করা হয়, তাহা হইলে প্রকৃত সত্য ও তথ্য বিকৃত হইতে পারে। লক্ষণার অসংযত এবং অবৈধ প্রয়োগে যাহাতে সত্যদৃষ্টি কলুষিত না হয়, সেজন্য অতি তীক্ষ্ণ ভাবে তাঁহারা সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই লক্ষণালভ্য অর্থ কত প্রকারের হইতে পারে? মম্মট, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকগণ লক্ষ্যার্থের বহু বৈচিত্র্য সম্পর্কে তাঁহাদের গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে সে প্রসঙ্গ হইতে বিরত থাকিতে হইল।

সামীপ্য, সারূপ্য, সমবায়, বৈপরীত্য, ক্রিয়া

একই শব্দ- ভিন্ন কালে একই বৃত্তি
" " ভিন্ন কালে ভিন্ন বৃত্তি।
ভিন্ন শব্দ- একই কালে ভিন্ন বৃত্তি
ভিন্ন বৃত্তি- একই কালের [illegible]

৪ (ক) ব্যঞ্জনা—শাব্দী

এ পর্য্যন্ত আমরা অভিধা, তাৎপর্য্য এবং লক্ষণা এই শক্তিত্রয়ের আলোচনা করিলাম। দেখা গেল, অভিধা-শক্তির দ্বারা বাচ্যার্থের বোধ হয়; তাৎপর্য্য-শক্তির দ্বারা বাক্যার্থের বোধ হয় এবং লক্ষণা-শক্তির দ্বারা লক্ষ্যার্থের বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দার্থের তত্ত্ব-বিচারে ইহাই শেষ কথা নহে। অভিধা, তাৎপর্য্য এবং লক্ষণা স্ব স্ব অর্থ উপস্থাপিত করিয়া নিঃশেষে নিবৃত্ত হইয়া গেলেও শ্রোতা বা পাঠকের চিত্তে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ একটি অর্থান্তর উদ্ভাসিত হইতে পারে। ঈদৃশ অর্থের নাম ব্যঙ্গ্যার্থ, এবং শব্দার্থের যে শক্তির মহিমায় ইহার উল্লাস সেই শক্তির নাম ব্যঞ্জনা-শক্তি। এই ব্যঞ্জনা-শক্তিলভ্য অর্থ কত বিপুল এবং বিচিত্র হইতে পারে তাহাই বর্ত্তমান প্রস্তাবে আলোচিত হইতেছে। একটি উদাহরণ গ্রহণ করিলে বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে। 'সূর্য্য অস্ত গিয়াছে'—এই বাক্যে অভিধা এবং তাৎপর্য্য-শক্তির দ্বারা আমরা যে অর্থটি পাই, তাহা অতি স্পষ্ট এবং সহজেই সর্ববজনবেদ্য। প্রথমে অভিধা-শক্তি বাক্যান্তর্গত 'সূর্য্য' 'অস্ত' এবং 'গিয়াছে' এই পদত্রয়ের বাচ্য অর্থগুলিকে শ্রোতার বুদ্ধিতে উপস্থাপিত করে। তারপর তাৎপর্য্য-শক্তি উক্ত বাচ্য অর্থগুলির পরস্পরের সহিত অন্বয় সাধিত করিয়া দিবাবসান-রূপ একটি অখণ্ড বাক্যার্থবোধকে উল্লসিত করে। এই বোধটী সর্ববসাধারণ। বাক্য শ্রবণের পর সকল শ্রোতারই সাধারণ ভাবে জ্ঞান হয় যে, রজনী সমাগত প্রায়। অভিধা ও তাৎপর্য্য-শক্তি তদতিরিক্ত অর্থান্তর বোধনে অক্ষম। কিন্তু এই একই বাক্য বিশিষ্ট বক্তার দ্বারা উচ্চারিত হইয়া বিশিষ্ট শ্রোতার নিকট বিবিধ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই অর্থগুলি বাচ্যাতিরিক্ত এবং ব্যক্তিভেদে বিলক্ষণস্বরূপ। অথচ কিছুতেই ঈদৃশ অর্থবোধ গুলিকে অস্বীকার করা যায় না; কারণ ইহারাই বোদ্ধার পরবর্ত্তী কর্ম্মপ্রবৃত্তি-গুলির জনক হয়। বোদ্ধা যদি উক্ত বাক্য হইতে তাদৃশ অর্থ না বুঝিতেন, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। সংগ্রাম-লিপ্সু জিগীষু নরপতি যখন তাঁহার সেনানায়কগণকে লক্ষ্য করিয়া উক্তবাক্য উচ্চারণ করেন, তখন ইহারা বুঝেন যে শত্রুশিবিরের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালাইয়া বিভ্রান্ত বিপক্ষকে মথিত মর্দ্দিত করার অনুকূল সময় উপস্থিত। তখন উক্ত বোধানুযায়ী তাঁহারা অনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। এই প্রবৃত্তির মূলে যে চিত্তবৃত্তি রহিয়াছে, মাত্র বাচ্যার্থ তাহার জনক নহে। আবার দূতী কর্ত্তৃক উচ্চারিত উক্ত একই বাক্য হইতে অভিসারিকার বোধ হইবে যে প্রিয়াভিসরণের বহু আকাঙ্ক্ষিত শুভলগ্ন উপস্থিত; সেইজন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। তেমনি যে নায়িকা ভূষণ প্রসাধনাদি দ্বারা সজ্জিতা হইয়া আসন্ন প্রিয়সমাগমের প্রতীক্ষায় আছেন, তাঁহার প্রতি সখীকর্ত্তৃক প্রযুক্ত ঐ বাক্যই বোধ জন্মাইবে যে প্রিয়তম আগত প্রায়। কর্ম্মরত শ্রমিক কর্ত্তৃক কথিত হইলে সহকর্ম্মিগণ বুঝিবে যে কর্ম্ম হইতে বিশ্রামের সময় আসিয়াছে, এইবার কাজ বন্ধ করিতে হইবে। আবার পরিচারকের ঐ কথা শুনিয়াই ধার্ম্মিক ব্যক্তি মনে করিবেন, দিবাবসানে সান্ধ্য উপাসনাদি বিধির অনুষ্ঠান করিতে হইবে! কোন হিতৈষী ব্যক্তি কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইয়া একই বাক্য সন্ধ্যাকালে বহির্গমনোদ্যত স্নেহভাজন ব্যক্তিকে বক্তার অভিপ্রায়টি বুঝাইয়া দিবে, 'বেশীদূর যাইও না'। গৃহস্থের উক্তবাক্য হইতে গোপালক বুঝিবে, গাভীগুলিকে এইবার ঘরে লইয়া আসিতে হইবে। বহুদূরাগত রৌদ্রতপ্ত বন্ধু বুঝিবেন যে আর গরমে কষ্ট হইবে না। দোকানে ভৃত্যগণ বুঝিবে, বিক্রেয় বস্তুগুলিকে আস্তে আস্তে গুছাইয়া ফেলিতে প্রভু আদেশ করিতেছেন। আবার প্রোষিতভর্ত্তৃকার বাক্য হইতে বুঝা যাইবে যে সেদিনের মত প্রিয়তমের প্রত্যাবর্ত্তন বিষয়ে তিনি হতাশ হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, কোন শব্দের বা বাক্যের বাচ্যার্থ বোধের পরেও বক্তা, শ্রোতা বা প্রসঙ্গাদির বৈশিষ্ট্য হেতু বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি

বহু অর্থান্তরের উদ্‌ভাস হইতে পারে। এমন কি, এক ব্যক্তির দ্বারা উচ্চারিত হইয়াও পূর্ব্বোক্ত বাক্যটি বিভি ব্যক্তির চিত্তে বিবিধ অর্থকে উল্লসিত করিতে পারে সুতরাং বাচ্যঅর্থ সঙ্কেতবশে নিয়ত হইলেও এই পরবর্ত্ত অর্থগুলি একান্ত অনিয়ত এবং নিরবধি। ইহাদের বৈচিত্র্যে অন্ত নাই।

এখন ঐরূপ অর্থগুলিকে শব্দের মুখ্য অর্থ এই জন্য বলা যায় যে ইহাতে শব্দের সঙ্কেত নাই, সুতরাং এইগুলি শব্দের স্বাভাবি অর্থ নহে। ইহারা তাৎপর্য্যার্থও নহে; কারণ, তাৎপর্য্য শ বাক্যান্তর্গত পদার্থগুলির অন্বয়মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। লক্ষ্যার্থের স্থলে অবকাশ নাই, কারণ মুখ্যার্থ গুলির মধ্যে অন্বয় বা তাৎপর্যে কোন বাধা নাই; এইরূপ অর্থের বোধের জন্য পূর্ব্বোক্ত তি শক্তির অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা নামক চতুর্থ শক্তি স্বীকার করিতে হয়।

ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রগুলি নিপুণভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যা উহা কখনও প্রধানতঃ শব্দকে আশ্রয় করিয়া আবার কখনও প্রধানতঃ অর্থকে আশ্রয় করিয়া উল্লসিত হয়। অবশ্য একথা স যে শব্দার্থের পরস্পর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। একটি অপরটি ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। কেবল শব্দ বা কেবল অর্থের ক একান্ত একক ভাবে চিন্তা করা যায় না। তথাপি ব্যঞ্জনা বি কোথাও শব্দের প্রাধান্য, আবার কোথাও বা অর্থের প্রাধান্য থা সম্ভবপর। যেখানে কোন বিশেষ পদ না থাকিলে ব্যঙ্গ্যার্থটি টিকে সেখানে উহা শব্দাশ্রয়ী। আবার যেখানে শব্দবিশেষের থাকা থাকার উপর ব্যঙ্গ্যার্থ নির্ভর করে না, যেখানে অর্থমাত্র উহা উপজীব্য, সেখানে উহাকে অর্থাশ্রয়ী বলা যায়। এই দৃষ্টিভ হইতে ব্যঞ্জনাকে শাব্দী এবং আর্থী ভেদে দুই শ্রেণীতে ভাগ ক যাইতে পারে। এখন প্রথমে শাব্দী-ব্যঞ্জনার আলোচনা ক যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে শব্দ দুই প্রকারে হইতে পারে, বাচক এবং লক্ষক। অভিধাশক্তির বলে বাচকশ

বাচ্য অর্থকে বুঝায় এবং লক্ষণাশক্তির বলে লক্ষক শব্দ লক্ষ্য অর্থকে বুঝাইয়া থাকে। ব্যঞ্জনা যখন বাচকশব্দকে আশ্রয় করিয়া উল্লসিত হয় তখন উহাকে অভিধামূলা বলা হয়, আবার উহা যখন লক্ষক শব্দকে আশ্রয় করে তখন উহার নাম লক্ষণামূলা।

অভিধামূলা ব্যঞ্জনার দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত কাব্যখণ্ডটি গ্রহণ করা যাইতে পারে;—

'অত্রান্তরে কুসুমসময়যুগম্, উপসংহরন্ অজৃম্ভত গ্রীষ্মাভিধানঃ ফুল্লমল্লিকাধবলাট্ট-হাসো মহাকালঃ।'—'ইতিমধ্যে গ্রীষ্মনামক মহাকাল কুসুমসময়যুগ উপসংহার করিয়া প্রস্ফুটিত মল্লিকা-ধবলাট্টহাস্যে শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইল।' এই কাব্যখণ্ডটি বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' নামক আখ্যায়িকা হইতে ধ্বন্যালোকের গ্রন্থকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। কবি এস্থলে বসন্তকালের পরে গ্রীষ্মঋতুর অভ্যাগমটি বর্ণনা করিতেছেন। ফুলের মাস দুইটীর অবসান হইল এবং বিকশিত মল্লিকার শুভ্রহাসিতে মণ্ডিত সুদীর্ঘ নিদাঘদিবস উপস্থিত হইল; রচনার বাচ্যার্থ এই পর্য্যন্তই।

কিন্তু এই বাচ্যার্থের প্রতীতির পর সহৃদয় পাঠকের চিত্তে একটি অর্থের দ্যোতনা হয়। রচনার শব্দ-প্রয়োগ-চাতুর্য্য মহাকাল-নামক মহাদেবের কথা মনে করাইয়া দেয়, তিনিও তো কালের সংহর্ত্তা; ধ্বংসের উল্লাসে তাঁহার অট্টহাস্য উচ্ছুসিত হইয়া উঠে; কারণ তিনি রুদ্র, সংহারের দেবতা। কিন্তু এই অর্থটিকে এখানে বাচ্য বলা যায় না। কবি নবনিদাঘের আবির্ভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলিয়াছেন; তিনি তো আর মহাদেবের বর্ণনা করিতে বসেন নাই। অথচ পাঠকের চিত্তে এইরূপ একটি অর্থেরও দ্যোতনা হউক ইহা কবির অভিপ্রেত; অন্যথা তিনি 'যুগ', 'উপসংহার', 'ধবলাট্টহাস', 'মহাকাল', প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিতেন না—যেগুলির অর্থসঙ্গতি মহাদেবের পক্ষেও সম্ভবপর। তিনি যদি বলিতেন 'বসন্তকালের অবসান ঘটাইয়া প্রস্ফুটিত-মল্লিকা-শোভিত দুঃসহ গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল',—তাহা হইলেও প্রসঙ্গানুকূল গ্রীষ্মবর্ণনার বাচ্যার্থের কিছুমাত্র

হানি হইত না। কিন্তু তাহাতে 'নিদাঘঋতু মহাদেবের ন্যায়'—এ
তুলনামূলক অর্থটির ব্যঞ্জনা পাওয়া যাইত না। এখানে ব্যঞ্জনা
এই জন্যই শব্দশক্তিমূলক যে ইহা যুগ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দে
উপর নির্ভরশীল। এই বিশিষ্ট শব্দগুলি না থাকিলে ব্যঙ্গ্যার্থ
টিকেনা। আবার শব্দগুলির বাচ্য বা অভিধেয় অর্থ হইতেই এখা
ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ হইতেছে বলিয়া ব্যঞ্জনাটি অভিধামূলা।

এস্থলে স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন উঠে যে পূর্ব্বোক্ত ব্যঙ্গ্যার্থটি
বাচ্যার্থ বলা হইবে না কেন? নানার্থক শব্দ মাত্রেরই একাধিক বা
অর্থ থাকে। সংস্কৃতে 'হরি' শব্দের অর্থ বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, য
সিংহ, সর্প, ভেক, বানর ইত্যাদি। যে কোন অভিধান খুলিলে
হরি শব্দের এই সব অর্থ পাওয়া যাইবে। এগুলি সমস্ত
এই শব্দের বাচ্য বা অভিধেয় অর্থ। তেমনই পূর্ব্বোদ্ধ
কাব্যখণ্ডটির মধ্যে 'মহাকাল' কথাটিরও দুইটি বাচ্য অর্থ আছে
মহান্ কাল এবং মহাকাল নামক শিব। তবে একটি অর্থকে বা
ও অন্য অর্থটিকে ব্যঙ্গ্য বলা হইতেছে কেন? দুইটি অর্থকেই বা
বলিতে দোষ কি? এই সংশয় নিরসনের জন্য কয়েকটি কথা ব
আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে 'অভিধাশক্তির আলোচনা কালে আম
দেখিয়াছি যে নানার্থক শব্দের প্রয়োগস্থলে বক্তার কোন্ অর্থটি
তাৎপর্য্য, তাহা প্রকরণ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বুঝিয়া লই
হয়। সেইরূপ শব্দ শ্রবণের পর শ্রোতার বুদ্ধিতে বিবিধ বাচ্য অর্থগু
একসঙ্গে ভিড় করিয়া দাঁড়াইলেও প্রকৃতপক্ষে কোন্ বিশেষ অর্থ
বক্তার অভিপ্রেত তাহা প্রকরণ, দেশ ও কালের ঔচিত্য, অভিপ্রা
বোধক বিশেষণ প্রভৃতি সামগ্রী বলিয়া দেয়। তখন একটিমা
বাচ্যার্থ গৃহীত হয়, অন্যগুলি নিরবকাশ হইয়া পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে
'সৈন্ধব' শব্দের উদাহরণে আমরা দেখিয়াছি যে বিভিন্ন প্রকর
উহা বিভিন্ন বাচ্য অর্থকে বুঝাইয়া থাকে। ভোজনকালে 'সৈন্ধ
আন বলিলে 'সিন্ধুজাত লবণ' বুঝিতে হয়। আবার গ্রামান্ত
যাইবার সময় অথবা যুদ্ধের সময় ঐ একই শব্দ উচ্চারিত হই

বোঝায় 'সিন্ধু দেশীয় ঘোটক'। সুতরাং এখানে দেখা যাইতেছে, সৈন্ধব শব্দের একাধিক বাচ্য অর্থ থাকিলেও প্রকরণই বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। আবার অভিপ্রায়-বোধক বিশেষণও অনেক সময় নানার্থক শব্দের অভিধাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। যেমন, যদি বলি 'শঙ্খ চক্রধারী হরি' তাহা হইলে সকলেই বুঝিবেন যে, এখানে 'হরি' শব্দের অর্থ বিষ্ণু। কারণ শঙ্খ-চক্র-ধারণরূপ বিশেষণ কেবল বিষ্ণুর পক্ষেই প্রযোজ্য। তাই এই বাক্যে হরি-শব্দের অর্থ কেহ বানর বা অন্য কিছু বুঝিবেন না। এখানে অভিপ্রায়-বোধক বিশেষণ বুঝাইয়া দিতেছে যে হরি শব্দের বহু অর্থের মধ্যে 'বিষ্ণু' অর্থই বক্তা বুঝাইতে চান। এই ভাবে যে যে সামগ্রী নানার্থক শব্দগুলিকে একটি বিশেষ অর্থে নিয়ন্ত্রিত করে তাহাদের একটি তালিকা পণ্ডিতগণ দিয়াছেন। তাহার বিস্তৃততর আলোচনা ঠিক এইস্থলে খানিকটা অবান্তর বলিয়া আর দেওয়া হইল না।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে প্রকরণ প্রভৃতি অভিধা-নিয়ামক কতকগুলি হেতু আছে যাহারা নানার্থক শব্দের কোন একটি মাত্র অর্থকে ক্ষেত্র বিশেষে বাচ্য অর্থরূপে উপস্থাপিত করে। সুতরাং সেইরূপ স্থলে অভিধা কোন একটি মাত্র অর্থ-বিশেষে নিয়ন্ত্রিত হইয়া গেলেও যদি শ্রোতার অর্থান্তরের বোধ হয়, তাহা হইলে এই পরবর্ত্তী বোধটিকে অভিধাজনিত বলা যায় না। এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বোদ্ধৃত কাব্যখণ্ডটিতে যে শিবের সহিত সাদৃশ্য-রূপ অর্থটির বোধ হইতেছে তাহাকে বাচ্য অর্থ বলা যাইতে পারে না। কারণ এখানে প্রসঙ্গ হইতেছে গ্রীষ্ম-বর্ণনা। তাই শিবের কথা এখানে একান্ত অপ্রাসঙ্গিক। মহাকাল শব্দের দুইটি বাচ্য অর্থ থাকিলেও এখানে প্রকরণই বলিয়া দিতেছে যে মহাকাল শব্দের 'মহান্ কাল' এইরূপ বাচ্য অর্থই গ্রাহ্য। তাছাড়া অভিপ্রায়-বোধক বিশেষণও এখানে অভিধাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। কবি লিখিয়াছেন,—'গ্রীষ্ম নামক মহাকাল'। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে

যে মহাকাল শব্দের বাচ্য অর্থ এখানে মহাকাল-নামক শিব হইতে পারে না। অথচ একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এই কবি-বাক্যটি পাঠ করিবার পর সহৃদয় চিত্তে গ্রীষ্মবর্ণনার অন্তরালে মহাকাল নামক শিবের প্রতীতি উদ্‌ভাসিত হয়। এই দ্বিতীয় অর্থটি যে বাচ্যার্থ নহে তাহা আমরা উপরেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি। এটি লক্ষ্যার্থও হইতে পারে না, কারণ লক্ষণার হেতু এখানে নাই। সুতরাং এটিকে ব্যঙ্গ্যার্থই বলিতে হইবে। আবার এই ব্যঙ্গ্যার্থটি মহাকাল, অট্টহাস, যুগসংহরণ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উপর নির্ভরশীল বলিয়া এই রচনাটি শব্দশক্তিমূলক ব্যঞ্জনার উদাহরণ। আবার এই শব্দগুলির বাচ্য অর্থ হইতেই পূর্ব্বোক্ত ব্যঙ্গ্যার্থটির বোধ হইতেছে। শব্দের অভিধাশক্তি বাচ্য অর্থটিকে বুঝাইয়া দেয়। সুতরাং এই ব্যঞ্জনাটিকে অভিধামূলক ব্যঞ্জনাও বলা যায়।

এখানে আর একটি প্রশ্ন আসে যে, শব্দ-শ্লেষে অলঙ্কারের সহিত এই শব্দশক্তি-মূলক ব্যঞ্জনার পার্থক্য কোথায়? শ্লেষ স্থলে একই শব্দ হইতে দুইটি অর্থের বোধ হইয়া থাকে—এখানেও তাহাই হইতেছে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে ভেদ কোথায়? এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, শ্লেষ স্থলে দুইটি অর্থই বাচ্য। কিন্তু শব্দশক্তি-মূলক ব্যঞ্জনার স্থলে একটি অর্থ বাচ্য এবং অন্যটি ব্যঙ্গ্য। এখানে এই বাচ্য এবং ব্যঙ্গ্যের মধ্যে নিমিত্ত-নৈমিত্তিক সম্পর্ক আছে। বাচ্যার্থটি নিমিত্ত বা কারণ এবং ব্যঙ্গ্যার্থটি নৈমিত্তিক বা কার্য্য। কিন্তু শ্লেষ অলংকারে যে দুইটী বাচ্য অর্থের বোধ হয়, তাহাদের মধ্যে এইরূপ নিমিত্ত নৈমিত্তিক সম্পর্ক নাই। তাহাদের উভয়ের সমান প্রাধান্য আছে। তাই গোবিন্দ তাঁহার 'কাব্যপ্রদীপ' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, শ্লেষলব্ধ অর্থদ্বয় যেন এক বৃন্তে বিধৃত দুইটী ফল। বাচক শব্দরূপ বৃন্তে এই অর্থদ্বয় দুইটী ফলের ন্যায় প্রকাশিত হয়। একটী বৃন্তই তাহাদের উপজীব্য বটে; কিন্তু তাহারা পরস্পর স্বতন্ত্র ও সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অভিধামূলক ব্যঞ্জনাস্থলে যে

অর্থদ্বয়ের প্রতীতি হইয়া থাকে তাহারা পরস্পর একান্ত স্বতন্ত্র নহে, একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। সেখানে বাচ্য অর্থই বৃন্ত, ব্যঙ্গ্যার্থটি তাহার ফল। এই ব্যঙ্গ্যফলটির প্রাণশক্তি বাচ্য-বৃন্ত হইতে আহৃত হইলেও বৃন্ত অপেক্ষা ফল উপাদেয়, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রকরণ প্রভৃতি সামগ্রীর দ্বারা শব্দগুলি একটি মাত্র বাচ্য অর্থে নিয়ন্ত্রিত হইয়া যাওয়ায় এখানে উভয় অর্থকেই বাচ্য বলা যায় না। কিন্তু শ্লেষ অলঙ্কার স্থলে অভিধানিয়ামক সামগ্রীর অভাবে উভয় অর্থই বাচ্য বলিয়া শ্লেষ ও অভিধামূলক ব্যঞ্জনার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

এ পর্য্যন্ত আমরা অভিধামূলক ব্যঞ্জনার আলোচনা করিয়াছি। এইবার লক্ষণামূলক ব্যঞ্জনার স্বরূপটি বুঝিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে লক্ষণার আলোচনা কালে আমরা দেখিয়াছি যে রূঢ়ি এবং প্রয়োজন ভেদে লক্ষণা দুই প্রকারের। সেই প্রয়োজন-মূলিকা লক্ষণার ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে সেখানে সূক্ষ্মভাবে ব্যঞ্জনা-শক্তিও কাজ করিতেছে। কারণ, লক্ষ্যার্থ বোধের পর যে প্রয়োজন-রূপ অর্থটির বোধ হয়, তাহা লক্ষণা-লভ্য হইতে পারে না। ব্যঞ্জনাই সেরূপ অর্থের প্রতীতি করাইতে পারে। উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি সহজে বুঝা যাইবে। 'গঙ্গাতে ঘোষপল্লী' এইটি প্রয়োজন-মূলিকা লক্ষণার স্থল। সেই প্রয়োজনটি লাভ করিতে হইলে প্রতীতির কোন্ কোন্ বিভিন্ন স্তর আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। প্রথমে অভিধাশক্তির বলে গঙ্গাশব্দের বাচ্য অর্থ 'জলপ্রবাহ' বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়। তারপর দ্বিতীয় স্তরে তাৎপর্য্যশক্তি বাক্যার্থের অন্বয় করিতে উদ্যত হইলে দেখা যায় যে গঙ্গাশব্দের জলপ্রবাহরূপ বাচ্য বা মুখ্য অর্থটি বাধিত হইয়া যাইতেছে, কারণ জলপ্রবাহের উপর ঘোষ-পল্লীর অবস্থিতি সম্ভবপর নহে। এই বাধার অপসারণের জন্য গঙ্গাশব্দ তাহার লক্ষণাশক্তির বলে তটরূপ অর্থকে উপস্থাপিত করে। তখন আর অন্বয়ের কোন বাধা থাকে না। এইটিকে আমাদের

বোধের তৃতীয়স্তর বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই স্তরে লক্ষণার সাহায্যে অন্বয়ের সমাধান হইয়া গেলেও শ্রোতার প্রতীতির অবসান এখানে হইয়া যায় না। যাহারা গঙ্গার একান্ত সমীপে বাস করে, তাহারা যে উহার অত্যন্ত শীতল ও পবিত্র বায়ু সমধিক উপভোগ করিয়া থাকে ইহাও শ্রোতা বুঝিতে পারেন। বস্তুতঃ এই বোধটি জন্মানই এখানে লক্ষণার প্রয়োজন। শৈত্য ও পবিত্রতার আধিক্য বোধ হউক এই অভিপ্রায়েই বক্তা এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি 'গঙ্গাতটে ঘোষপল্লী' এইরূপ প্রয়োগ করিতেন। সুতরাং এই প্রয়োজন বোধটিও গঙ্গাশব্দের দ্বারা নিষ্পাদিত হইতেছে। কিন্তু গঙ্গাশব্দের কোন্ শক্তি এইরূপ বোধের নিষ্পাদক তাহাই বিবেচ্য। অভিধা, তাৎপর্য্য বা লক্ষণা-শক্তির প্রত্যেকেই যতটুকু অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারে তাহা পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি; সেই অর্থগুলির মধ্যে শৈত্য ও পবিত্রতার আতিশয্যকে আমরা পাই নাই। তাই এইরূপ অর্থবোধের জন্য শব্দের শক্ত্যন্তর স্বীকার করিতে হয়। তাহাই ব্যঞ্জনা। সুতরাং দেখা গেল, প্রয়োজন-মূলিকা লক্ষণার স্থলে প্রয়োজন বোধটি ব্যঞ্জনাকৃত এবং এইটিই আমাদের প্রতীতির চতুর্থ ও চরমস্তর। এই ভাবে, 'বালকটি সিংহ' ইত্যাদি প্রয়োজন-মূলিকা লক্ষণার স্থলে বালকের পরাক্রমাতিশয্য-রূপ প্রয়োজন ব্যঞ্জনালভ্য বুঝিতে হইবে। এই সমস্ত স্থলেই যে ব্যঞ্জনার পরিচয় আমরা পাইলাম তাহার নাম লক্ষণামূলিকা ব্যঞ্জনা।

শব্দ ও তাহার শক্তি
৪ (খ) ব্যঞ্জনা—আর্থী

পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় দেখা গেল, শাব্দী ব্যঞ্জনার দুইটি বিভাগ, প্রথমটি অভিধামূলা এবং দ্বিতীয়টি লক্ষণামূলা। এইবার আর্থী ব্যঞ্জনার স্বরূপটি বুঝিতে হইবে। যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থটি শব্দ অপেক্ষা অর্থের উপর অধিক নির্ভরশীল তাহা আর্থী ব্যঞ্জনার স্থল। শব্দ এখানে গৌণভাবে সহকারী মাত্র; অর্থই এইরূপ ব্যঞ্জনার উল্লাসের প্রধান হেতু। যদিও শব্দার্থের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, তথাপি পূর্ব্বোক্ত প্রাধান্য বা অপ্রাধান্যকে মানদণ্ড ধরিয়া শাব্দী ও আর্থীভেদ করা হইয়াছে। সুতরাং শাব্দী ব্যঞ্জনার স্থলে মাত্র শব্দ এবং আর্থী ব্যঞ্জনার স্থলে মাত্র অর্থই ব্যঞ্জনার উত্থাপক—এরূপ আশঙ্কা অমূলক। কারণ অর্থহীন শব্দ বা শব্দহীন অর্থ লোক-ব্যবহারে অনুপযোগী। তাই সাহিত্য-দর্পনকার বলিয়াছেন,—'অর্থ শব্দের দ্বারা বোধিত হইয়া অর্থান্তরের ব্যঞ্জনা করে; শব্দও অর্থের আশ্রয় হইয়া ব্যঞ্জনার হেতু হয়। সুতরাং একটি যখন ব্যঞ্জক, অন্যটি তখন সহকারী।'

শাব্দী-ব্যঞ্জনা স্থলে দেখা গিয়াছে যে, কোন বিশেষ শব্দ না থাকিলে ব্যঞ্জনাটি টিকিতেছে না; সেই শব্দটির পরিবর্ত্তনে ব্যঞ্জনাও লোপ পাইতেছে। কিন্তু আর্থী-ব্যঞ্জনায় কোন বিশেষ শব্দের তাদৃশ অপরিহার্য্য উপযোগিতা নাই। এখানে শব্দের যেরূপই পরিবর্ত্তন করা যাক না কেন, বাচ্য অর্থটি ঠিক থাকিলেই ব্যঞ্জনার প্রসার হইবে। আর্থী-ব্যঞ্জনার উদাহরণ স্বরূপ 'সূর্য্য অস্ত গিয়াছে'—এই বাক্যটি ধরা যাইতে পারে। এখানে বিভিন্ন শ্রোতার প্রতি যে বিভিন্ন অর্থের দ্যোতনা হইতেছে তাহার হেতু ঐ বাক্যান্তর্গত কোন বিশেষ শব্দ নহে। 'সূর্য্য অস্ত গিয়াছে' না বলিয়া, যদি 'রবি অস্তাচলে গমন করিয়াছেন' অথবা 'সন্ধ্যাকাল উপস্থিত' ইত্যাদি বাক্যও প্রয়োগ করা হইত তাহা হইলেও তাদৃশ ব্যঙ্গ্যার্থগুলির প্রতীতির কোন বিঘ্ন হইত না; কারণ দিবাবসান-রূপ বাচ্য অর্থই

এস্থলে ব্যঞ্জনার উপজীব্য। সুতরাং শব্দবিন্যাস যেরূপই হউক না কেন সেই অর্থটি অটুট থাকিলেই তাহাকে আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন শ্রোতার প্রতি পূর্ব্বোক্ত ব্যঙ্গ্যার্থগুলি আপনা হইতেই উল্লসিত হইবে। সেই জন্য ঈদৃশ ব্যঞ্জনাকে আর্থী ব্যঞ্জনা বলা হইয়াছে। বাচ্য অর্থ একটি হইলেও তাহা হইতে ব্যঙ্গ্য অর্থ যে বহু হইতে পারে তাহাও পূর্ব্বোক্ত উদাহরণেই দেখা গিয়াছে।

আর্থী ব্যঞ্জনার স্থলে বিবিধ সামগ্রী ব্যঙ্গ্যার্থের উল্লাস ও বৈচিত্র্যের সহায়ক হয়। এইরূপ কতকগুলি সামগ্রীর কথা আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন। দুই একটি উদাহরণ দিলে প্রসঙ্গটি সহজবোধ্য হইবে। অনেক সময় দেখা যায়, যিনি বক্তা তাঁহার বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করিয়া বাচ্য অর্থ অর্থান্তরের অভিব্যঞ্জনা করে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নলিখিত কবিতাটি গ্রহণ করা যাইতে পারে,—

'অতি-পৃথুলং জলকুম্ভম্
গৃহীত্বা সমাগতাস্মি সখি ত্বরিতম্।
শ্রম-স্বেদ-সলিল-নিঃশ্বাস-
নিঃসহা বিশ্রাম্যামি ক্ষণম্ ॥'

—'সখি! অতি বৃহৎ জলকলস লইয়া দ্রুত আসিয়াছি। তাই শ্রমজনিত ঘামে ও নিঃশ্বাসে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি; কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি।'

কোন দুঃশীলা নায়িকা একাকিনী নদীতে জল আনিতে গিয়া উপনায়কের সহিত মিলিত হইয়া আসিয়াছে। সম্ভোগজনিত শ্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। নিঃশ্বাস দ্রুত বহিতেছে এবং সমস্ত শরীর একান্ত অবসন্ন। তাহার অপরাধী চিত্ত এই দুর্ব্বলতা ও অবসাদের একটা ব্যাখ্যা দিতে চাহিতেছে; কারণ সখী তাহাকে বিলক্ষণ চেনে। পাছে সত্য ব্যাপারটি প্রকাশিত হইয়া পড়ে সেই ভয়ে নায়িকা পূর্ব্বাহ্ণেই এইরূপ উক্তি করিয়া অন্যরূপ সংশয়ের অবসান করিতে চাহিতেছে। একে কলসটি অতি বৃহৎ, তাহাতে আবার জলে পূর্ণ। সেটি আবার দ্রুত বহন করিয়া আনিতে

হইয়াছে। সুতরাং অত্যন্ত পরিশ্রমে অবসাদ হওয়া স্বাভাবিক—ইহাই নায়িকার উক্তির অভিপ্রায়। কিন্তু চতুরা সখী নায়িকার চরিত্র বিশেষভাবে জানে। সে এই উক্তির বাচ্য অর্থ ছাড়া আরও কিছু বুঝিবে। সে বুঝিবে যে, ব্যভিচারিণী আত্মকৃত অপরাধ গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই পরবর্ত্তী বোধের বিষয়টি ব্যঙ্গ্য। যে কামিনী উক্ত কথাগুলি বলিয়াছে তাহার দুঃশীলতা হেতু শ্রোতার চিত্তে এইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থের উল্লাস হইতেছে। যদি নায়িকা শুদ্ধশীলা হইত তাহা হইলে তাহার এইরূপ উক্তি মাত্র বাচ্যার্থে পর্য্যবসিত হইতে পারিত। এখানে দেখা গেল, কাব্যবর্ণিত কথাগুলি যিনি বলিতেছেন তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সাধারণ বাচ্যার্থ হইতে অসাধারণ ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হইতেছে।

এই ব্যঞ্জনাকে অর্থশক্তিমূলিকা বলিবার কারণ এই যে, প্রধানতঃ বক্তব্য অর্থটিকে অবলম্বন করিয়া ইহার প্রসার হইতেছে। শব্দের উপর ইহা ততটা নির্ভরশীল নহে। বাক্যান্তর্গত শব্দগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেও বাচ্য অর্থটি ঠিক থাকিলেই ব্যঙ্গ্যার্থটি আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। 'আমার শারীরিক অবসাদ কুম্ভবহন জনিত'—এইটিই এই স্থলে বাচ্য অর্থ। এই অর্থটি যে কোনপ্রকার শব্দ চয়নের দ্বারা নিবেদিত হউক না কেন, বক্তার বৈশিষ্ট্য জ্ঞান থাকিলেই শ্রোতৃচিত্তে পূর্ব্বোক্ত অর্থান্তরটি উদ্ভাসিত হইবে।

এইভাবে যাহাকে কিছু বলা হইতেছে তাহার বৈশিষ্ট্যের জন্যও ব্যঙ্গ্যার্থের উদ্ভাস হইতে পারে। কোন নায়িকা নায়ক-প্রসাদনের নিমিত্ত বিশ্বস্তা মনে করিয়া দূতী প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধৃষ্টা দূতী তাঁহার সে বিশ্বাস রক্ষা করে নাই। সে নিভৃতে আত্মতৃপ্তি সাধন করিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাকে অবসন্না দেখিয়া নায়িকা বলিতেছেন;—

'ঔন্নিদ্র্যং দৌর্ব্বল্যম্
চিন্তালসত্বং সনিঃশ্বসিতম্।
মম মন্দভাগিন্যাঃ কৃতে
সখি! ত্বামপ্যহহ পরিভবতি ॥'

'হায় হায় সখি। মন্দভাগিনী আমার জন্য নিদ্রাহীনতা, দৌর্ব্বল্য, চিন্তাজনিত আলস্য ও দীর্ঘশ্বাস তোমাকেও পীড়া দিতেছে।' বস্তুতঃ সখীর এতাদৃশ অনুচিত প্রবৃত্তি নায়িকার পূর্ব্ব হইতেই বিদিত। তাই শঙ্কিতা নায়িকা স্বীয় উক্তির বাচ্যার্থের অন্তরালে যে অর্থান্তরের ইঙ্গিত করিতেছেন তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। সখীগত দৌর্ব্বল্যাদি যে নায়কসম্ভোগ জনিত ইহাই উক্তিটির ব্যঙ্গ্যার্থ। যে সখীটিকে লক্ষ্য করিয়া নায়িকা কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছেন তাহার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যই এইরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থ উল্লাসে সাহায্য করিতেছে। সখীর চরিত্রচ্যুতির কথা যাহার জানা নাই তাহার নিকট নায়িকার অভিপ্রেত ব্যঙ্গ্য অর্থটি প্রকাশিত হইবে না। সে শুধু বাচ্য অর্থটিই বুঝিবে যে, সখীটি সমদুঃখভাগিনী ও একান্ত সহানুভূতিশীলা। এতদতিরিক্ত কোন অর্থান্তরের বোধ তাহার হইবে না।

এমনি করিয়া অন্য ব্যক্তির সান্নিধ্যহেতু বাচ্য অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি ব্যঙ্গ্যার্থের উল্লাস হইতে পারে। কোন নায়িকা উপনায়ক নিকটেই আছেন জানিয়া স্বীয় প্রতিবেশিনীকে বলিতেছেন,—

'নুদত্যনার্দ্রমনাঃ শ্বশ্রূর্মাং গৃহভরে সকলে।
ক্ষণমাত্রং যদি সন্ধ্যায়াং ভবতি ন বা ভবতি বিশ্রামঃ।'

'আমার নিঠুরা শাশুড়ী আমাকে সমস্ত গৃহকর্মে নিযুক্ত করেন। সন্ধ্যাকালে ক্ষণমাত্র বিশ্রাম হয় কি না হয়।'

নায়িকার নিয়ত কর্মব্যস্ততাহেতু কেবল সন্ধ্যাকালে সামান্য বিশ্রামের সম্ভাবনা থাকে—ইহাই উক্তিটির বাচ্যার্থ। কারণ কথাগুলির আভিধানিক অর্থ হইতে এতদতিরিক্ত কিছু আমরা পাই না। কিন্তু সন্নিহিত উপনায়ক বাচ্যাতিরিক্ত একটি অর্থ বুঝিবেন। নায়িকা সন্ধ্যাকালে গোপন মিলনের সংকেত করিতেছেন —এইরূপ একটি বিলক্ষণ বোধ তাঁহার চিত্তে উদ্ভাসিত হইবে। যদি অন্য কেহ এই নিতান্ত রহস্য কথা জানেন, তবে তাঁহারও ঈদৃশ বাচ্যাতিরিক্ত বোধটি হইবে। এই বোধটি যে ব্যঞ্জনামূলক— একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উপনায়কের সন্নিধিরূপ বৈশিষ্ট্যই ঈদৃশ বোধের হেতু। অন্যথা, মাত্র পূর্ব্বোক্ত বাচ্য অর্থেরই বোধ হইত; ব্যঙ্গ্যার্থের উল্লাসই হইত না।

এখন বাক্যার্থের বৈশিষ্ট্যহেতু কিরূপে ব্যঙ্গ্যার্থের উদ্ভাস হয় তাহাই দেখা যাইতেছে। নর্মদার তীরে ভ্রমণকালে নায়ক নায়িকাকে বলিতেছেন;—

'উদ্দেশোহয়ং সরস-কদলী-শ্রেণি-শোভাতিশায়ী
কুঞ্জোৎকর্ষাঙ্কুরিত-রমণী-বিভ্রমো নর্মদায়াঃ।
কিঞ্চৈতস্মিন্ সুরত-সুহৃদ-স্তন্বি! তে বান্তি বাতা
যেষামগ্রে সরতি কলিতাকাণ্ড-কোপো মনোভূঃ॥'

'নর্মদার এই উচ্চভূমি সরস কদলীশ্রেণীর শোভায় সমৃদ্ধ; এখানে কুঞ্জগুলির পুষ্প-সম্ভারে যেন রমণীর বিলাস অঙ্কুরিত হইয়াছে। অধিকন্তু, হে তন্বি! এখানে প্রিয়-মিলনের সহায়ক সেই পবন প্রবাহিত হইতেছে, যাহার অগ্রে মনোজ অকস্মাৎ কুপিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন।'

এখানে, নর্মদা নদীর মনোরম তীরভূমির বর্ণনা বাচ্য। কিন্তু বিশেষণগুলি এমন ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে, তাহা হইতে একটি অর্থান্তরের ব্যঞ্জনা হইতেছে। কুঞ্জমধ্যে মিলনের আহ্বানই বাচ্যের অন্তরালবর্ত্তী সেই ব্যঙ্গ্যার্থ। নদীতীরের একান্ত নির্জনতা, সরস কদলীশ্রেণীর স্নিগ্ধ গোপনীয়তা, লতাকুঞ্জের পুষ্প-সমৃদ্ধি এবং মলয়ের মন্দ প্রবাহ প্রভৃতি সমস্ত বাচ্যই ঐ ব্যঙ্গ্যার্থের স্ফুরণে সাহায্য করিতেছে। উদ্দেশ অর্থাৎ উর্দ্ধভূমি কথাটির দ্বারা জনসাধারণের বিরলতা সূচিত হইতেছে, সরস এই বিশেষণটি শুষ্ক পত্রাভাবে কর্কশ শব্দের অভাব প্রকাশ করিতেছে। শ্রেণী কথাটিও সার্থক, প্রান্ত-বেষ্টন ও ঘনচ্ছায়ার ইঙ্গিত ইহার মধ্যে আছে। 'তন্বি' এই সম্বোধন পদটি নায়িকার উপভোগ-যোগ্যতা প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এখানে বাচ্যগুলি এমন ভাবে সজ্জিত হইয়াছে যে তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত ব্যঙ্গ্যার্থটি অনায়াসে উল্লসিত হইতেছে।

এইবার প্রস্তাব অর্থাৎ প্রকরণ হইতে কি ভাবে বাচ্যাতিরিক্ত অর্থান্তরের ব্যঞ্জনা হইয়া থাকে তাহাই দেখা যাইতেছে। প্রোষিত-ভর্তৃকা কোন নায়িকা নায়কান্তরের প্রতি অভিসারে প্রস্তুত হইয়াছেন; ইতিমধ্যে তাঁহার সখী জানিলেন যে নায়িকার প্রবাস-গত পতির আসিতে আর বিলম্ব নাই; সুতরাং অভিসার-বেশ ত্যাগ করিতে হইবে। তাই চতুরা সখী নায়িকাকে বলিতেছেন;—

'শ্রূয়তে সমাগমিষ্যতি তব প্রিয়োঽদ্য প্রহরমাত্রেণ।

এবমেব কিমিতি তিষ্ঠসি, তৎসখি। সজ্জয় করণীয়ম্॥'

'শুনিতেছি, তোমার প্রিয় অদ্য প্রহরকাল মধ্যেই আসিবেন! সুতরাং হে সখি! এই ভাবে আছ কেন? যাহা করণীয় তাহা কর।'

এখানে আসন্ন প্রিয়-সমাগমের জন্য প্রস্তুতির উপদেশই বাচ্য। কিন্তু সেই বাচ্যের অন্তরালে যে একটি বিশেষ অর্থান্তরের অভি-ব্যঞ্জনা হইতেছে তাহা উক্ত বাচ্যার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত। অভি-সরণ ক্রিয়া হইতে নিবৃত্তির নির্দ্দেশই সেই ব্যঙ্গ্য অর্থ। প্রিয় অদ্যই আসিবেন কালান্তরে নহে; তাহাও আবার প্রহর মধ্যে—বিশেষ বিলম্বে নহে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় অভিসরণ প্রয়াস ত্যাগ করাই সমীচীন। ঈদৃশ নিষেধের ব্যঞ্জনা কেবল তাঁহার নিকটেই হইবে যিনি অভিসরণ প্রস্তাব বা প্রকরণটি জানেন। যিনি তাহা জানেন না, তিনি কথাগুলির নিতান্ত বাচ্য আটপৌরে অর্থই গ্রহণ করিবেন। নিতান্ত বাচ্যগ্রাহী যাঁহারা তাঁহাদিগকে খোলটি লইয়াই তৃপ্ত থাকিতে হয়; যাঁহারা মর্ম্মজ্ঞ তাঁহারাই কেবল শাঁসের সন্ধান পান। যে সমস্ত সামগ্রী সেই বাচ্যাতিরেকী অর্থের সন্ধানে সাহায্য করে, দেখা গেল, প্রস্তাব বা প্রকরণ তাহাদের অন্যতম।

অনেক সময়ে আবার দেশ অর্থাৎ স্থানের বৈশিষ্ট্য হইতেও ব্যঙ্গ্য অর্থের বোধ হইয়া থাকে। কোন নায়িকা দূতীমুখে নায়কের নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, কুঞ্জকাননে কুসুম-চয়ন-কালে তাঁহার সহিত দেখা হইবে। কিন্তু সঙ্গে অন্য সখীরাও পুষ্পাহরণ করিতেছেন,

অথচ দূতীও আসিয়া পড়িয়াছে, তাই বিদগ্ধা নায়িকা সখীদের উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

'অন্যত্র যূয়ং কুসুমাবচায়ং কুরুধ্বমত্রাস্মি করোমি সখ্যঃ।

নাহং হি দূরং ভ্রমিতুং সমর্থা, প্রসীদতায়ং রচিতোঽঞ্জলির্বঃ॥'

—'হে সখীগণ! তোমরা অন্যত্র কুসুম চয়ন কর, আমি এইখানে করি। কারণ আমি বেশীদূর ভ্রমণ করিতে সমর্থ নহি। কিছু মনে করিও না। হাত যোড় করিতেছি।'

নায়িকা স্বীয় অসামর্থ্যহেতু বেশীদূর যাইতে পারিবেন না। অথচ সন্নিহিত কুসুমগুলি সকলে মিলিয়া চয়ন করিয়া ফেলিলে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অন্য কুসুমের সন্ধানে স্থানান্তরে যাইতে হইবে। সেজন্য একান্ত অনুরক্তা সখীদিগকে তিনি বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহারা যেন অন্যত্র গিয়া তাঁহার জন্য এই কুসুমগুলি রাখিয়া যান।

নায়িকার উক্তির বাচ্য অর্থ এই পর্য্যন্তই দাঁড়ায়। কিন্তু স্থানটি এতই বিবিক্ত ও উপভোগযোগ্য যে দূতী সহজেই বুঝিয়া ফেলিবে, নায়িকা ঠিক ওই স্থানটিতেই প্রিয়-সমাগমের বাঞ্ছা করেন। স্থান তাদৃশ অনুকূল না হইলে দূতীরও সেরূপ বিলক্ষণ বোধ হইত না। যদি জনবহুল স্থানে সকলের মুক্ত-দৃষ্টির সম্মুখে নায়িকা ঠিক একই উক্তি করিতেন তাহা হইলে এইরূপ একটি অর্থের দ্যোতনা কিছুতেই হইত না। তখন উহা মাত্র বাচ্যবোধনেই নিরস্ত থাকিত। সখীদিগের স্থানান্তর গমনে অনুরোধই বক্তৃতাৎপর্য্যরূপে গৃহীত হইত—তদতিরিক্ত অর্থের অনুসন্ধানে চিত্তের বৃত্তি হইত না। কিন্তু এখন স্থান মহিমায় বাচ্যের অন্তরালে যে ব্যঙ্গ্য অর্থটির উদ্ভাস হইতেছে তাহার স্বরূপ দাঁড়ায়—'তাহাকে এইখানেই পাঠাইয়া দিও।' এই পরবর্ত্তী অর্থটি বাচ্যাশ্রয়ী হইয়াও বাচ্যাতিরেকী। বস্তুতঃ সমস্ত ব্যঙ্গ্যার্থেরই ধর্ম্ম তাই, বাচ্যকে আশ্রয় করিয়া তাহার উল্লাস, অথচ বাচ্যকে ছাড়াইয়া তাহা সুদূর প্রসারী।

এইবার, কাল-বৈশিষ্ট্য হইতে কেমন করিয়া বাচ্যার্থ প্রতীতি হয়

তাহাই দেখান যাইতেছে। বসন্তের অভ্যাগমে প্রিয়তম গুরুজনের আদেশে প্রবাসে যাইতে উদ্যত হইলে প্রিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,

'গুরুজন-পরবশ প্রিয় !
কিং ভণামি তব মন্দভাগিনী অহকম্।
অদ্য প্রবাসং ব্রজসি ব্রজ,
স্বয়মেব শ্রোষ্যসি করণীয়ম্ ॥'

—হে প্রিয় ! তুমি গুরুজনের অধীন ; মন্দ-ভাগিনী আমি তোমায় কি বলি ? আজ তুমি প্রবাসে যাইতেছ, যাও ; আমার যাহা করণীয় তাহা তুমি নিজেই শুনিবে।'

প্রিয়তম পরায়ত্ত ; সুতরাং তাঁহাকে স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন করা নিরর্থক। আপন দুর্ভাগ্যই দুঃখের জন্য দায়ী। তাই প্রিয়-প্রবাস -গমনে নায়িকা অন্তরায় হইতে চান না। এই উদার বসন্তকালে যখন প্রোষিতজন গৃহে প্রিয়া-সন্নিধানে ফিরিয়া আসেন তখন পতি প্রবাসে যাইতে চান যাউন ; কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী যে কৃত্যটুকুতে নায়িকার একান্ত স্বাতন্ত্র্য আছে তাহা তিনি সম্পাদন করিবেন এবং সে সংবাদ প্রবাসে পতি অবশ্যই শুনিতে পাইবেন। এই বাচ্য হইতে যে ব্যঙ্গ্যটুকু পাওয়া যায় তাহা হইতেছে,—'তুমি এ সময়ে প্রবাসে গেলে আমি আর বাঁচিব না'। সুতরাং 'আজ তুমি প্রবাসে যাইতেছ, যাও'—এই বাচ্য বিধি শেষপর্য্যন্ত ব্যঙ্গ্য নিষেধে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এখন, কাকু অর্থাৎ উচ্চারণের বিশিষ্ট ভঙ্গী হইতে কেমন করিয়া অর্থান্তরের ব্যঞ্জনা হয় তাহাই দেখা যাইতেছে। বেণীসংহার নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের মধ্যে সহদেবের প্রতি ভীমসেনের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য। কৌরবগণের সহিত সন্ধির প্রস্তাবে অসহিষ্ণু হইয়া ভীম ক্রোধ প্রকাশ করিলে সহদেব যখন বলিলেন যে তাহাতে যুধিষ্ঠির অসন্তুষ্ট হইবেন তখন ভীম বলিতেছেন,—

'তথাভূতাং দৃষ্ট্বা নৃপসদসি পাঞ্চালতনয়াম্
বনে ব্যাধৈঃ সার্দ্ধং সুচিরমুষিতং বল্কল-ধরৈঃ।

বিরাটস্যাবাসে স্থিতমনুচিতারম্ভ-নিভৃতম্
গুরুঃ খেদং খিন্নে ময়ি ভজতি নাদ্যাপি কুরুষু ॥'

—'রাজসভায় পাঞ্চাল-দুহিতার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়াও বল্কলধারী ব্যাধগণের সহিত বনে সুদীর্ঘ কাল বাস করিয়াছি ; বিরাটের গৃহে অনুচিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া গোপনে কালাতিপাত করিয়াছি ; এইভাবে নানা প্রকারে গ্লানি-প্রাপ্ত আমার প্রতি রাজা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, কৌরবদের প্রতি আজও হন না ?'

এখানে ভীমের উক্তির শেষের দিকে যে প্রশ্নসূচক উচ্চারণ ভঙ্গীটি আছে তাহাতে ইহাই ব্যঙ্গ্য হইতেছে যে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া অশেষ অপকারী কৌরবদের প্রতিই ক্রুদ্ধ হওয়া যুধিষ্ঠিরের উচিত। এই অর্থটি বাচ্য নহে ; কারণ বাচ্যার্থটি প্রশ্ন মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং তদতিরিক্ত বোধটিকে ব্যঞ্জনালভ্য বুঝিতে হইবে।

কখনও বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চেষ্টা-বিশেষের ফলে একটি নূতন অর্থের অভিব্যঞ্জনা হইয়া থাকে। কোন উপনায়ক নায়িকার নিকট হইতে মিলনের সময়টি জানিয়া লইতে চান। কিন্তু অপরের সান্নিধ্য হেতু নায়িকা তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না। অবশেষে যেরূপ চেষ্টার দ্বারা তিনি স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ছিলেন তাহা নিম্নলিখিত কবিতাটিতে সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে।

'সংকেতকালমনসং বিটং জ্ঞাত্বা বিদগ্ধয়া।
হসন্নেত্রার্পিতাকূতং লীলাপদ্মং নিমীলিতম্ ॥'

—'প্রেমিক গোপন মিলনের সময়টি জানিতে চান ইহা বুঝিতে পারিয়া বিদগ্ধা নায়িকা সহাস্যনয়নে ক্রীড়াপদ্মটিকে এমন ভাবে নিমীলিত করিলেন যে তাহাতে তাঁহার হৃদ্‌গত অভিলাষ নিবেদিত হইল।'

সন্ধ্যাকালে পদ্ম মুদ্রিত হয় ; সুতরাং সহাস্য-পদ্মনিমীলন-রূপ চেষ্টার দ্বারা 'সন্ধ্যাই সংকেতকাল'—ইহা দ্যোতিত হইয়াছে। নায়িকা তাদৃশ চেষ্টাপরায়ণা না হইলে উক্ত ব্যঙ্গ্য অর্থটির বোধ

হইত না। সুতরাং দেখা যাইতেছে শারীরিক চেষ্টাও অনেক সময় অকথিত অর্থের ব্যঞ্জনা করিয়া থাকে।

উপরে যে কয়টি ব্যঞ্জক হেতুর উদাহরণ দেওয়া হইল তাহারা যে সব সময় একক ভাবেই উপস্থিত থাকিয়া ব্যঙ্গ্যার্থপ্রকাশে সাহায্য করে তাহা নহে; প্রায়ই দেখা যায়, ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশের স্থলে একাধিক হেতু মিলিত হইয়া থাকে। সেই মিলিত-সামগ্রী পুঞ্জের আনুকূল্যে ব্যঙ্গ্যার্থটি প্রকাশিত হয়। নিম্নে এইরূপ একটি স্থলের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে,—

'শ্বশ্রূরত্র নিমজ্জতি,
অত্রাহং দিবসকং প্রলোকয়।
মা পথিক! রাত্র্যন্ধক!
শয্যায়ামাবয়োর্মঙ্‌ক্ষ্যসি ॥'

—'এখানে শাশুড়ী নিদ্রায় মগ্ন থাকেন, এখানে আমি। সারাদিন দেখিয়া রাখ। হে রাতকাণা পথিক! তুমি আমাদের শয্যায় যেন ঢুকিয়া পড়িবে না।'

কোন প্রোষিত-ভর্তৃকা কামিনী দৈবাৎ গৃহাগত এক তরুণ পথিককে দেখিয়া তৎপ্রতি অনুরাগবশে মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করিয়াছেন। হৃদয়ের গোপন-কথা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করা যায় না। তাই চতুরা নায়িকা এইভাবে আভাসে ইঙ্গিতে আপন চিত্তের আকূতি পথিককে জানাইয়া দিতে চান; আশা এই যে, পথিক বুদ্ধিমান্ হইলে অবশ্যই মর্ম্মজ্ঞ হইবেন। পতি প্রবাসগত; শাশুড়ী গৃহে থাকিলেও বার্দ্ধক্যবশে নিদ্রায় একান্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন। সুতরাং সেদিক্ হইতে কোন বিঘ্নের আশঙ্কা নাই। তরুণী স্বীয় পৃথক্ শয্যা নির্দ্দেশ করিয়া জানাইতে চান যে, তিনি একাকিনীই শয়ন করেন। তাই সেখানে প্রবেশ ও নির্গম উভয় বিষয়েই শঙ্কারাহিত্য বর্ত্তমান। দিবস না বলিয়া 'দিবসক' কথাটি প্রয়োগ করা হইয়াছে! এখানে ক-প্রত্যয়টি কুৎসিতার্থে বিহিত। যে দিবস প্রিয় মিলনের পরিপন্থী তাহাকে কুৎসিতই বলা যায়।

পথিক যদি প্রদোষকালে আসিতেন তাহা হইলে এই 'পোড়া' দিবাভাগ আর অন্তরায় হইতে পারিত না। এখন দীর্ঘ দিনটি কেবল পরস্পরকে দেখিয়াই কাটাইতে হইবে। তবে সেই দেখাতে কোন বিঘ্ন নাই; প্রাণ ভরিয়াই দেখা যাইতে পারে। এই অর্থটি 'প্র' এই উপসর্গের দ্বারা সূচিত হইতেছে। 'পথিক' ও 'রাত্র্যন্ধক' —এই দুই বিশেষণেরও সার্থকতা লক্ষণীয়। "পথিক" শব্দটি পদ-চারিসুলভ অবসাদ ও বিস্মৃতির দ্যোতনা করিতেছে। দীর্ঘ পথ ভ্রমণ হেতু শ্রান্তি ও আলস্যবশে নবাগত অতিথি স্থান-কাল-পাত্রাদির ঔচিত্য বিস্মৃত হইতে পারেন! তার উপর তিনি আবার রাত্র্যন্ধক—রাতকানা। এদিকে স্থানটি নূতন, পরিবেশ একান্ত অপরিচিত। সুতরাং এরূপ অবস্থায় দৃষ্টিবিভ্রম অসম্ভব নহে। ভ্রান্তিবশে তিনি যে শয্যান্তরে ঢুকিয়া পড়িবেন না—তাহাই বা কে বলিতে পারে? ঈদৃশ আশঙ্কা যে স্বাভাবিক তাহাই 'পথিক' ও 'রাত্র্যন্ধক' পদদ্বয় দ্যোতনা করিতেছে। এই সম্ভাবিত আশঙ্কা ও বিপত্তির নিরসনের জন্য তরুণী পূর্ব্বাহ্নেই জানাইয়া রাখিতেছেন যে, ক্লান্ত ও রাতকানা পথিক যেন রাত্রে উঁহাদের শয্যায় ঢুকিয়া না পড়েন। তরুণীর ঈদৃশ শঙ্কা ও নিষেধবাক্য অস্বাভাবিকও নহে। বস্তুতঃ সম্ভাবিত প্রবেশের নিষেধই কবিতাটির বাচ্যার্থ! এতদতিরিক্ত অন্য কোন অর্থ অভিধাশক্তি আমাদিগকে দেয় না।

কিন্তু এই একান্ত বাহ্য ও স্থূল বাচ্য অর্থের অন্তরালে যে সূক্ষ্ম অর্থান্তরটির ব্যঞ্জনা হইতেছে তাহার স্বরূপ উহা হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। মদনাহতা অনুরাগিণী আসন্ন রজনীর নীরব অন্ধকারে আপন শয্যায় তরুণ পথিককে আহ্বান জানাইতেছেন। মর্ম্মজ্ঞ বুঝিতে পারিবেন, নায়িকার সমগ্র উক্তিটির ইহাই ব্যঙ্গ্যার্থ। বাচ্য অর্থ নিষেধ হইলেও ব্যঙ্গ্য অর্থ বিধিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। মুখ 'আসিও না' বলিলেও হৃদয় বলিতেছে—'আসিও'।

হৃদয়ের সেই নীরব ভাষার অবগুণ্ঠিত অর্থ কেবলমাত্র বিদগ্ধ-

চিত্তেই উল্লসিত হইবে। কারণ ইতিপূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, বাচ্য অর্থটি সকলের জন্য হইলেও ব্যঙ্গ্য অর্থটি তাদৃশ নহে। ইহার একটি নিজস্ব আভিজাত্য আছে, যাহা ইহাকে জনতার কোলাহল হইতে দূরে রাখে।

এই স্থলটি নিপুণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এখানে বক্তা ও বোদ্ধব্য উভয়ের বৈশিষ্ট্য মিলিত হইয়াই ঈদৃশ ব্যঙ্গ্যার্থের উল্লাসে আনুকূল্য করিতেছে। কথাগুলি বলিতেছেন একটি প্রোষিতভর্ত্তৃকা তরুণী; আর যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উক্তিটির প্রয়োগ হইয়াছে তিনি নবাগত তরুণ পথিক, যাঁহার হাব-ভাব-কটাক্ষ-চেষ্টাদিতে অবশ্যই উপভোগযোগ্যতার আশ্বাস বক্ত্রী পাইয়াছেন। প্রধানতঃ এই উভয় বৈশিষ্ট্যরূপ সামগ্রীই এই ক্ষেত্রে উক্তরূপ ব্যঙ্গ্যার্থের উল্লাসে সহায়ক হইয়াছে। তাছাড়া, বচনভঙ্গী, স্থানকালাদির বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সামগ্রী তো গৌণভাবে আছেই। বক্ত্রী যদি তরুণী না হইয়া বৃদ্ধা বা অন্ততঃ প্রৌঢ়াও হইতেন, তিনি যদি একান্ত শুদ্ধশীলা ও ব্রতচারিণী হইয়া থাকিতেন, অথবা যদি তিনি প্রোষিতভর্ত্তৃকা না হইতেন তাহা হইলে পথিক যেমনই হউক না কেন পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির এতাদৃশ ব্যঙ্গ্য অর্থ কিছুতেই সুলভ হইত না।

আবার অন্য পক্ষে, গৃহাগত পুরুষ যদি বৃদ্ধ বা জটা-গৈরিক-ধারী সন্ন্যাসী হইতেন, তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি বেশভূষা ও চেষ্টাদি যদি কামনাবাসনার একান্ত পরিপন্থী হইত তাহা হইলে বক্ত্রী যেমনই হউন না কেন—তাঁহার কথাগুলি মাত্র বাচ্যার্থেই পর্য্যবসিত হইত; পূর্ব্বোক্ত ব্যঙ্গ্যার্থে আমরা পৌঁছাইতে পারিতাম না। তাছাড়া গৃহের জনবিরলতা, শাশুড়ীর বার্দ্ধক্য প্রভৃতি পরিবেশের বৈশিষ্ট্যও গৌণভাবে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশে সাহায্য করিতেছে। সুতরাং এখানে দেখা গেল, কোন একটি মাত্র সামগ্রী যে ব্যঙ্গ্যার্থের উল্লাসের হেতু হইয়াছে তাহা নহে; যিনি বলিতেছেন ও যাঁহাকে বলা হইতেছে তাঁহাদের উভয়ের বৈশিষ্ট্যই প্রধানভাবে ব্যঙ্গ্যার্থের উত্থাপক হইয়াছে।

বস্তুতঃ ইতিপূর্ব্বে আমরা যে উদাহরণ কবিতাগুলির উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের প্রায় সকল গুলিতেই একাধিক সামগ্রী মিলিত হইয়া ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশে সাহায্য করিতেছে। সুতরাং প্রতি সামগ্রীর জন্য পৃথক্ পৃথক্ উদাহরণ বাক্যের খুব বেশী প্রয়োজন ছিল না। কেবল বিস্পষ্ট বোধের জন্যই বিভিন্ন স্থলের উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যঙ্গ্যার্থের উত্থাপক সামগ্রীগুলি এত ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ যে প্রায়ই ব্যঞ্জনাক্ষেত্রে তাদৃশ একাধিক সামগ্রীর সম্মেলন স্বাভাবিক। তবে কোনটি মুখ্যভাবে, কোনটি বা গৌণভাবে ব্যঙ্গ্যার্থের দ্যোতনায় সহায়ক হইয়া থাকে। বিশ্বনাথ তাঁহার সাহিত্য-দর্পণের মধ্যে আর্থী ব্যঞ্জনার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ কবিতায় ব্যঞ্জনার উত্থাপক পাঁচটি সামগ্রীর সম্মিলিত আনুকূল্য দেখাইয়াছেন। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

> 'কালো মধুঃ কুপিত এষ চ পুষ্পধন্বা,
> ধীরা বহন্তি রতিখেদহরাঃ সমীরাঃ।
> কেলীবনীয়মপি বঞ্জুল-কুঞ্জ-মঞ্জু
> দূরে পতিঃ কথয় কিং করণীয়মদ্য॥'

—'বসন্তকাল সমাগত; মদনদেবও কুপিত হইয়াছেন; রতিশ্রমাপহারী মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। এই ক্রীড়া কাননও অশোক-কুঞ্জে মনোরম হইয়া উঠিয়াছে; পতি দূরে আছেন; আজ কি করা যায় বল।'

কোন প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা কামিনী বসন্তের অভ্যাগমে মদনাহতা হইয়া বিশ্বস্তা সখীকে এই কথাগুলি বলিয়াছেন। বসন্তের পুষ্পসম্ভার ও মলয়ানিল নায়িকাকে উন্মনা করিয়াছে। তাঁহার কথাগুলির বাচ্যার্থের অন্তরালে একটি একান্ত আর্ত্তহৃদয়ের যে আকুল আকূতি ধ্বনিত হইতেছে তাহার স্বরূপ অনুসন্ধান করিলে পাই উপভোগক্ষম একটি পুরুষের জন্য নায়িকার প্রার্থনা। তাহাই সমগ্র উক্তিটির ব্যঙ্গ্যার্থ। কিন্তু এই ব্যঙ্গ্যার্থের উল্লাসে বক্ত্রীর অবস্থাবৈশিষ্ট্যই একমাত্র সহায়ক নহে। এখানে বক্তা, বোদ্ধব্য, বাক্য, প্রকরণ, দেশ

ও কাল এবং হয়তো বা কাকু ও চেষ্টা—এ সকলের বৈশিষ্ট্যই সমবেতভাবে কার্য্য করিতেছে। নায়িকার বিরহাবস্থা, সখীর বিশ্বস্ততা, বাক্যগুলির উদ্দীপকতা, প্রকরণের প্রণয়-প্রসঙ্গত্ব, দেশ ও কালের কামোদ্রেকিতা, নায়িকার ভাবানুকূল বচনভঙ্গী ও তাদৃশ হাবভাবাদি—এই সমস্ত সামগ্রীপুঞ্জের সম্মিলিত ফল হইতেছে পূর্ব্বোক্ত ব্যঙ্গ্যার্থটির দ্যোতনা।

এ পর্য্যন্ত আমরা ব্যঙ্গ্যার্থের স্বরূপ ও তাহার বিচিত্র প্রকারভেদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, শাব্দী ও আর্থীভেদে প্রথমতঃ ব্যঞ্জনা দ্বিবিধ। শাব্দী ব্যঞ্জনা আবার অভিধা-মূলিকা বা লক্ষণামূলিকা হইতে পারে। আর্থী ব্যঞ্জনাও বক্তা, বোদ্ধব্য, প্রকরণ প্রভৃতি বহু বিচিত্র সামগ্রীকে অবলম্বন করিয়া বিবিধভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ব্যঞ্জনা ছাড়া অভিধা ও লক্ষণা নামক শব্দের যে শক্তিদ্বয় আছে তাহার আলোচনা ইতিপূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

এখন এই শব্দার্থতত্ত্বের বিস্তৃততর আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া সাহিত্যে তাহার প্রয়োগবিধি ও উপযোগিতার কথা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

অলঙ্কারবাদ ও রীতিবাদের স্বরূপবিচার

কবিকৃতির স্বরূপানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ কাব্যের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নিপুণভাবে অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে তাঁহারা শব্দের বাচ্য অর্থের উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন; উহার ব্যঙ্গ্যার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন না। তাই তাঁহাদের কাব্য-সমীক্ষার মধ্যে শব্দ ও অর্থের বাচ্য অলঙ্কারগুলিই বিশিষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের মতে দোষহীন ও অলঙ্কৃত শব্দার্থই কাব্য। পরবর্ত্তীকালে বামন এই অলঙ্কারবাদীদের মতের অসম্পূর্ণতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার রীতিবাদ প্রচার করেন। কিন্তু ইহারা কেহই শব্দের বাচ্যার্থের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বিভিন্ন শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ অথবা খুব জমকাল রচনারীতির উপর যে কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে না, ইদানীন্তনকালে আমাদের ভারতচন্দ্রের রচনাবলীর অধিকাংশ স্থল তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতচন্দ্র শক্তিমান্ কবি হইয়াও কাব্য-কলার যাহা একান্ত বহিরঙ্গ উপাদান সেই অলঙ্কার বা রীতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই আপনার বিপুল সৃষ্টি-প্রতিভাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন—সত্যিকারের স্থায়ী, কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। এই শ্রেণীর কবিরা কাব্যপুরুষের একান্ত বাহ্য রূপটি দেখিয়া ও তাহার জয়গান করিয়াই তৃপ্ত থাকেন—তাঁহার অন্তরাত্মার সন্ধানে অগ্রসর হন না। সুতরাং ইহাদের রচনা 'কানের ভিতর দিয়া' হয়তো 'মরমে পশিলেও' 'প্রাণ আকুল করে না'। সহৃদয়ের অন্তরলোকে স্থায়ী মুদ্রাঙ্ক রাখিয়া যাইবার শক্তি এ জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টির থাকে না।

বস্তুতঃ অলঙ্কারবাদীদিগের মতের নিঃসারতা এই একটি মাত্র যুক্তির দ্বারাই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে, সালঙ্কার রচনা কাব্য হয় নাই অথচ একান্ত নিরলঙ্কার বাক্যও পরম উপাদেয় কাব্য

হইয়াছে—এরূপ উদাহরণ সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে একেবারেই দুর্লভ বা বিরল নহে। আমরা সংস্কৃত সাহিত্য হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া আমাদের উক্তির সার্থকতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছি। মাত্র অলঙ্কারের উপরেই যে কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভরশীল নহে তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য 'সাহিত্য-দর্পণের' একজন টীকাকার নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির উল্লেখ করিয়াছেন—

'তরঙ্গ-নিকরোন্নীত-তরুণীগণ-সঙ্কুলা।
সরিদ্বহতি কল্লোল-বাহ-ব্যাহত-তীরভূঃ ॥'

—'তরঙ্গমালার দ্বারা উর্দ্ধে নীত তরুণীগণ কর্তৃক পরিব্যাপ্ত নদী তাহার কল্লোলময় প্রবাহ দ্বারা তীরভূমিকে আঘাত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।'

এই কবিতাটিতে বেশ জমকাল ধরণের শব্দালঙ্কার অনুপ্রাস আছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। পদবিন্যাসের চাতুর্য্য হেতু কবিতাটির আবৃত্তি বেশ শ্রুতিসুখকরও হইয়াছে সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া ঈদৃশ রচনাকে সত্যিকারের কাব্য বলা যায় না। ইহা শব্দগ্রন্থনের পারিপাট্য মাত্র। শব্দশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গেই ইহার মাধুর্য্য বিগলিত ও রিক্ত হইয়া যায়। পাঠকের ভাবলোকে ইহার ক্ষীণধারা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শুষ্ক হইয়া উঠে।

গোবিন্দ তাঁহার কাব্যপ্রদীপের মধ্যে অনুরূপভাবে স্বরচিত একটি অলঙ্কৃত অকাব্যের উদাহরণ দিয়াছেন। সেটি এ প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য,

'মধ্যেব্যোম স্ফুরতি সুমনোধন্বিনঃ শাণচক্রম্
মন্দাকিন্যা বিপুল-পুলিনাভ্যাগতো রাজহংসঃ।
অত্রুশ্ছেদে ত্বরিতচরণ-ন্যাসমাকাশলক্ষ্যাঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ শ্রবণ-পতিতং পুণ্ডরীকং মৃগাঙ্কঃ ॥'

'আকাশের মধ্যস্থলে মৃগাঙ্ক শোভাবিস্তার করিতেছে। ইহা কুসুম ধনুর অস্ত্র শাণিত করিবার চক্র; ইহা মন্দাকিনীর বিপুল

তীরভূমিতে আগত রাজহংস; ইহা দিবাবসানে দ্রুতপদে সঞ্চরণশীলা আকাশলক্ষ্মীর কর্ণ হইতে পতিত একটী শুভ্র কমল।'

এই কবিতাটির প্রকৃতি নিপুণভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে অনুপ্রাস এবং রূপক আছে। কবি শুধু একটি রূপক দিয়াই তাঁহার চন্দ্রোদয় বর্ণনা শেষ করেন নাই। তিনি পরপর তিনটি রূপকের প্রয়োগ করিয়াছেন—ইহা শাণচক্র, ইহা রাজহংস, ইহা পুণ্ডরীক। কিন্তু এত আয়োজন সত্ত্বেও তাঁহার অলঙ্কৃত বাক্যগুলি কাব্য হইয়া উঠে নাই। রসজ্ঞচিত্তে ইহার আবেদন কতটুকু? শ্রোতা বা পাঠকের ভাবলোকে ইহার প্রতিক্রিয়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

এইবার কবি ভারতচন্দ্রের রচনা হইতে অলঙ্কারভারাক্রান্ত অকাব্যের একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। বর্ষাবর্ণনা প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

'ভুবনে ভরিল তূর্ণ নদনদী পরিপূর্ণ
বিরহিণী বেশচূর্ণ ভাবিয়া অভর্ষা,
বিদ্যুতের চক্‌মকি ডাহুকের মক্‌মকি
কামানল ধক্‌ধকি বড় হৈল কর্ষা ॥
ময়ুর ময়ূরী নাচে চাতকিনী পিউ যাচে
আরকি বিরহী বাঁচে বুঝিনু নিকর্ষা।
ভারতের দুঃখমূল কেবল হৃদয়ে শূল
ফুটালি কদম্বফুল আ আরে বর্ষা ॥'

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, এই রচনাটির মধ্যে বেশ জমকাল ধরণের অনুপ্রাস বহুলভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভারতচন্দ্র এ জাতীয় শব্দালঙ্কার প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এখানে অনুপ্রাস প্রয়োগের আগ্রহে তিনি কষ্টকল্পনাও কম করেন নাই। 'অভর্ষা', 'কর্ষা' ও 'নিকর্ষা'—এই শব্দগুলি মাত্র বর্ষাশব্দের সহিত অনুপ্রাস রক্ষার জন্য আমদানি করা হইয়াছে, নতুবা ভাষার প্রয়োগবিধিতে এগুলির প্রসিদ্ধি নাই। 'চক্‌মকি,' 'মক্‌মকি' 'ধক্‌ধকি'—

কথাগুলির মধ্যেও কবির শব্দালঙ্কার প্রয়োগের আগ্রহাতিশয্য প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। রচনাটির শেষের দিকে অর্থালঙ্কার রূপকেরও সমাবেশ করা হইয়াছে। কদম্বফুলকে দুঃখমূল এবং হৃদয়শূলরূপে বর্ণনা করিয়া কবি রূপক প্রয়োগের নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

কিন্তু এত প্রচেষ্টাসত্ত্বেও এখানে কবিকর্ম শ্রেষ্ঠকাব্যের গৌরবলাভ করে নাই। ইহা অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত হইয়াও সারবান্ হইয়া উঠে নাই। কবিতাটির আবৃত্তি পাঠক ও শ্রোতার শ্রুতি-কণ্ডূতির উপশম করে মাত্র; সহৃদয়ের চিত্তলোকে ইহার স্থায়ী প্রতিক্রিয়া নাই। যে রচনা চমৎকৃতিহীন—যাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের উল্লাস নাই তাহা শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্য্যাদা দাবী করিতে পারে না। এতাদৃশ কবিকৃতি ভূষিত শবশরীরের মত অনুপাদেয়।

এইতো গেল অলঙ্কৃত বাক্যেরও অকাব্যত্বের কথা। এইবার নিরলঙ্কার বাক্য যে পরম রমণীয় কাব্য হইতে পারে—তাহাই বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে অকাল বসন্তের বর্ণনা হইতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে;—

'মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈক-পাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষীম্
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥'

—'ভ্রমর নিজ প্রিয়ার অনুবর্ত্তন করিতে করিতে একই কুসুম পাত্রে মধু পান করিয়াছিল। আর কৃষ্ণসার মৃগ তাহার শৃঙ্গের দ্বারা স্পর্শসুখে মুদ্রিত-নয়না মৃগীকে চুলকাইয়া দিতে লাগিল।'

অকাল বসন্তের আবির্ভাবে সমস্ত প্রাণিজগতে যে অনুরাগের শিহরণ সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাই কবি বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু কবিতাটির শব্দার্থের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাইবে, এখানে ভাষা নিরাভরণা। মধ্যে মধ্যে সামান্য অনুপ্রাসের স্পর্শ থাকিলেও তাহাকে অনায়াসে অকিঞ্চিৎকর মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু

তথাপি কবিতাটী পাঠ করিলে পাঠকের চিত্তে যে কাব্যানন্দের অনুভূতি হয় তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত অলঙ্কৃত কবিতাগুলিতে পাই না। সুতরাং কবি-কর্ম্মের দিক্ দিয়া বিচার করিলে ঈদৃশ সৃষ্টিকে সার্থক বলিতে হয়।

কুমারসম্ভব কাব্যেরই অন্য একটি স্থল হইতে একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—যেখানে দেখা যাইবে যে কাব্য-লক্ষ্মী অনলঙ্কৃতা হইয়াই সবিশেষ মনোহারিণী হইয়াছেন। মহর্ষি অঙ্গিরা হিমালয়ের নিকট আসিয়া পার্ব্বতীর বিবাহ প্রস্তাব করিতেছেন। তখন কন্যা পিতার নিকটেই উপবিষ্টা ছিলেন। গুরুজনের সান্নিধ্যে আপনার পরিণয়ের প্রসঙ্গে কুমারীচিত্তে যে অনুরাগমিশ্র লজ্জার উদয় হওয়া স্বাভাবিক—তাহারই বর্ণনাসূত্রে কবি লিখিয়াছেন,—

'এবং বাদিনি দেবর্ষৌ
পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলা-কমল-পত্রাণি
গণয়ামাস পার্ব্বতী॥'

—'দেবর্ষি যখন এই ভাবে বলিতেছিলেন তখন পার্ব্বতী পিতার পার্শ্বে অধোমুখী হইয়া ক্রীড়াপদ্মের পত্রগুলি গণনা করিতে লাগিলেন।'

এখানে কাব্যশ্রী যে নিতান্ত নিরাভরণা, তাহা প্রতিপন্ন করিতে খুব বেশী যুক্তি তর্কের অবকাশ নাই। অবশ্য স্বভাবোক্তিকে অলঙ্কার ধরিয়া এবং এই কবিতাটিতে কুমারীস্বভাবের বর্ণনা আছে বলিয়া যে সমস্ত আলবঙ্কারিক অলঙ্কারের উপর ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইবেন তাঁহাদের সহিত তর্ক করিব না, কারণ মর্য্যাদার খাতিরে তাঁহাদের অতি-সাহসের প্রশ্রয় দিতে হইলে,—

'জল পড়ে
পাতা নড়ে'—

—ইত্যাদি রচনাকেও পরম রমণীয় কাব্য বলিতে হয়। বস্তুতঃ সাহিত্য-বিচারের প্রাথমিক জ্ঞানও যাঁহাদের নাই তাঁহারাও

অনায়াসে বলিতে পারিবেন যে,—'এবং বাদিনি দেবর্ষৌ'— ইত্যাদি কবিতাটি হইতে তাঁহারা প্রচুর আনন্দ পাইতেছেন এবং সে আনন্দ কোন বিশেষ অলঙ্কার জনিত নহে।

রবীন্দ্রনাথের বহু রচনার নাম করা যায় যেখানে বাক্য নিরলঙ্কার হইয়াও শ্রেষ্ঠ কাব্যত্ব লাভ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁহার 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সুদীর্ঘ কবিতার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিলেই আমাদের উক্তির সারবত্তা প্রমাণিত হইবে।

পিতারপ্রবাস যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন দেখিয়া আসন্ন-বিচ্ছেদ-ভীতা শিশুকন্যা অত্যন্ত কাতরা হইয়াছে। পিতা বিদেশে না যান ইহাই তাহার অন্তরের কামনা। কিন্তু সেই কামনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সাধ্য তাহার নাই। সে কেবল আপন হৃদয়ের স্নেহাধিকার প্রচার করিয়াছে—'যেতে আমি দিব না তোমায়'। অভিমানিনী কন্যার এই নিতান্ত সহজ সরল উক্তিটি একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই পিতৃহৃদয়কে অভিভূত করিয়াছে। নিম্নে কবিতাটীর একাংশ উদ্ধার করা যাইতেছে,—

'বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্যমন
কন্যা মোর চারিবছরের। এতক্ষণ
অন্য দিনে হয়ে যেত স্নানসমাপন;
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে; আজি তার মাতা
দেখে নাই তারে। এত বেলা হয়ে যায়,
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁষে,
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্তদেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কী জানি কী ভেবে
চুপিচাপি বসে ছিল। কহিনু যখন

'মা গো আসি' সে কহিল বিষণ্ণনয়ন
ম্লানমুখে, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'
যেখানে আছিল বসে রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'
তবুও সময় হল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল॥

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হতে কী শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা এত স্পর্ধা ভরে,
'যেতে আমি দিব না তোমায়'। চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোটো হাতে
গরবিনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্তক্ষুদ্রদেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুকভরা স্নেহ!
ব্যথিত হৃদয় হতে বহু ভয়ে লাজে
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে। শুধু বলে রাখা 'যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি'। হেন কথা কে পারে বলিতে,
'যেতে নাহি দিব'।

উদ্ধৃত কবিতাংশটি কাব্যের দিক্ দিয়া যে পরম উপাদেয় হইয়াছে, তাহা সহৃদয় মাত্রেরই অনুভবসিদ্ধ। অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এস্থলে বাক্যগুলি একান্ত অনলঙ্কৃত হইয়াই নিবদ্ধ হইয়াছে। আসন্ন বিদায়ের প্রাক্কালে বিচ্ছেদভীরু দুইটি স্নেহকাতর হৃদয়ের আর্ত্ত হাহাকারটি মাত্র কবি অত্যন্ত সহজ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ কাব্যের পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা গেল, অলঙ্কারের মহিমাতেই বাক্য কাব্যত্ব প্রাপ্ত

হয়—এইরূপ একটি মতবাদের ভিত্তিভূমি অত্যন্ত দুর্ব্বল। অথচ আমরা জানি, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সমালোচকগণ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অলঙ্কারবাদের উপর প্রচুর আস্থা স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন। কাব্য-স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহাদের উক্তিগুলি হইতেই একথার অনুমোদন পাওয়া যাইবে।

ভামহ, দণ্ডী, রুদ্রট প্রভৃতি অলঙ্কারবাদী কাব্য-সমালোচকগণ বরাবর শব্দ এবং অর্থকে কাব্যের স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অগ্নিপুরাণের মধ্যে কাব্য-কলা সম্পর্কে আলোচনা আছে। সেখানে গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—'কাব্য হইতেছে সেইরূপ বাক্য, যাহা গুণ এবং অলঙ্কারযুক্ত, দোষবর্জিত এবং সংক্ষেপে অভিপ্রেতার্থ-যুক্ত পদাবলী'। ভামহ তাঁহার কাব্যালঙ্কারের মধ্যে বলিয়াছেন,—'শব্দ এবং অর্থের সাহিত্যই কাব্য'। কাব্যাদর্শের গ্রন্থকার দণ্ডী কাব্য-স্বরূপ বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—'অভিপ্রেত অর্থযুক্ত পদসমূহই কাব্যের শরীর'। বামন তাঁহার কাব্যালঙ্কারের মধ্যে লিখিয়াছেন,—'কাব্য অলঙ্কারের দ্বারা উপাদেয় হয়। সৌন্দর্য্য অলঙ্কার, তাহা দোষ-বর্জন এবং গুণালঙ্কারের গ্রহণের দ্বারা সম্ভবপর'। এখানে দেখা যাইতেছে, বামন অলঙ্কার শব্দটি একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে কাব্য-সৌন্দর্য্যই অলঙ্কার। সেই সৌন্দর্য্য লাভ করিতে হইলে কাব্যকে দোষরহিত এবং গুণালঙ্কার-যুক্ত হইতে হইবে। এই দ্বিতীয় অলঙ্কার শব্দের দ্বারা বামন অনুপ্রাস-উপমা-রূপকাদি বাচ্য অলঙ্কারগুলিকেই ধরিয়াছেন।

রুদ্রট তাঁহার কাব্যালঙ্কার-গ্রন্থে ভামহের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,—'প্রকৃত পক্ষে শব্দ ও অর্থই কাব্য'। বলা বাহুল্য, ইহারা শব্দ ও অর্থ বলিতে শব্দের অভিধা শক্তি ও বাচ্য অর্থকেই বুঝিতেন। কাব্যে অভিধার প্রাধান্য সম্পর্কে অগ্নিপুরাণে একটি স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায়—'শাস্ত্রে শব্দের প্রাধান্য, ইতিহাসে সত্যের প্রাধান্য। কিন্তু কাব্যে অভিধা প্রধান বলিয়া উহা শাস্ত্র ও ইতিহাস হইতে বিভিন্ন।'

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অলঙ্কারবাদীরা আসলে বাচ্যার্থবাদী। শব্দের বাচ্যার্থের মধ্যেই তাঁহারা কাব্যসৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান করিতেন। কাজেই অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার ও উপমা প্রভৃতি অর্থালঙ্কারকেই তাঁহারা কাব্য-সৌন্দর্য্যের হেতু বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের এই মতবাদ যে যুক্তিসহ নহে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি।

যে সব সাহিত্য-সমালোচক অলঙ্কারবাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারা অলঙ্কারকে গৌণ করিয়া শব্দার্থের গুণকেই মুখ্য স্থান দেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, কবিকৃতির সৌন্দর্য্য ততটা অলঙ্কারের উপর নির্ভর করে না, যতটা করে শব্দ এবং অর্থের ওজঃ, প্রসাদ প্রভৃতি বিভিন্ন গুণের উপর। এই সমালোচক-গোষ্ঠীর মনের কথাটি আমরা পাই বামনের উক্তির মধ্যে। বামন লিখিয়াছেন,—'রীতি কাব্যের আত্মা। বিশিষ্ট পদ রচনার নাম রীতি এবং সেই বিশেষ হইতেছে গুণস্বরূপ।' কাব্যে অলঙ্কার অপেক্ষা শব্দার্থের গুণগুলি যে অধিক উপাদেয় ও কাব্যশোভার আধায়ক, বামন গুণালঙ্কারের ভেদ নির্ণয় করিতে গিয়া স্পষ্টই তাহা বলিয়াছেন—'শব্দ এবং অর্থের যে ধর্ম্মগুলি কাব্যের শোভা বিধান করে তাহারাই গুণ; এবং তাহারা হইতেছে ওজঃ, প্রসাদ প্রভৃতি—যমক উপমাদি নহে। কারণ কেবল যমক, উপমাদি কাব্যের শোভা উৎপাদন করিতে পারে না, কিন্তু কেবল ওজঃ, প্রসাদ প্রভৃতি কাব্য শোভার বিধান করিতে পারে।'

এখানে দেখা যাইতেছে, বামন শব্দার্থের গুণগুলিকে কাব্য সৌন্দর্য্যের মূলীভূত হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। তবে তাঁহার মতবাদে অলংকারের স্থান কোথায় তাহাও তিনি অব্যবহিত পরের সূত্রে বলিয়াছেন,—

'তদতিশয়-হেতবস্ত্বলংকারাঃ।'

—'কিন্তু অলঙ্কারগুলি তাহার আতিশয্যের হেতু।'

শব্দ ও অর্থের অলংকারগুলি যে কাব্যসৌন্দর্য্যের আধিক্য-বিধানে সহায়ক তাহা বামন মানিতে রাজী আছেন। কিন্তু তাই বলিয়া এগুলিকে কাব্যের স্বরূপ বলিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে বামন যে শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি এইরূপ,—

'যদি ভবতি বচশ্চ্যুতং গুণেভ্যো
বপুরিব যৌবন-বন্ধ্যমঙ্গনায়াঃ।
অপি জনদয়িতানি দুর্ভগত্বম্
নিয়ত-মলংকরণানি সংশ্রয়ন্তে॥'

—'রমণীর যৌবনহীন অঙ্গের ন্যায় বাক্য যদি গুণচ্যুত হয় তাহা হইলে জনপ্রিয় বহু অলংকারও নিশ্চিত দুর্ভগত্বকে আশ্রয় করে।'

গুণ এবং অলঙ্কারের মধ্যে কোন্‌টি অধিক উপাদেয় তাহাই একটি লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া এখানে দেখান হইয়াছে। যে রমণীর অঙ্গ হইতে যৌবনশ্রী বিদায় লইয়াছে হারবলয়াদি ভূষণ তাহার কতটুকু শোভা বর্দ্ধন করিতে পারে? তেমনি যে রচনায় ওজঃ, প্রসাদ প্রভৃতি শব্দার্থের গুণ নাই তাহা যমক, উপমাদি দ্বারা অলংকৃত হইলেও উপাদেয় হয় না। তবে গুণালংকারের দুর্লভ মিলনে যে সৌন্দর্য্য উপচিত হইবে তাহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ।

রচনায় অলংকার অপেক্ষা গুণের উৎকর্ষের কথা বলিতে গিয়া বামন আরও বলিয়াছেন,—

'পূর্ব্বে নিত্যাঃ।'
'পূর্ব্বে গুণা নিত্যাঃ। তৈর্বিনা
কাব্য-শোভানুপপত্তেঃ।'

—'পূর্ব্বেরগুলি অর্থাৎ গুণগুলি নিত্য; কারণ তাহাদিগকে বাদ দিলে কাব্যশোভার উপপত্তি হয় না।'

বামনের এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে অলঙ্কারগুলিকে তিনি অনিত্যই মনে করিয়াছেন। সুতরাং কোন কাব্যের মধ্যে সেগুলি কখনও থাকে, কখনও বা থাকে না। অলংকৃত হইলে রচনা অধিক

সুন্দর হয়; কিন্তু তাই বলিয়া অনলংকৃত হইলেও তাহার কাব্যত্বের হানি হইবে না, যদি তাহা ওজঃ প্রসাদ প্রভৃতি গুণযুক্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বামনের রীতিবাদ গুণবাদেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

কিন্তু নাম যাহাই দেওয়া হউক না কেন, কবিকর্মের স্বরূপ-নির্ণয়ে বামনের মতবাদ আমাদিগকে খুব বেশী দূর আগাইয়া দিতে পারে নাই। বামন তাঁহার গ্রন্থে শব্দার্থের দশটি গুণের কথা বলিয়াছেন। সেগুলি হইতেছে ওজঃ, প্রসাদ, শ্লেষ, সমতা, সমাধি, মাধুর্য্য, সৌকুমার্য্য, উদারতা, অর্থব্যক্তি এবং কান্তি। এই গুণগুলির স্বরূপ সম্পর্কে গ্রন্থকার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, কাব্যপুরুষের আত্মানুসন্ধান করিতে যাইয়া তিনি তাঁহার অবয়বসংস্থানটিই দেখিয়াছেন। আত্মতত্ত্বটি হয় অস্পৃষ্ট অথবা ঈষৎস্পৃষ্ট মাত্র হইয়াছে। আমাদের এই উক্তিটির ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

উপরে যে দশটি গুণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি শব্দ এবং অর্থ—এ উভয়েরই গুণ হইতে পারে। ইহারা যখন শব্দগুণ হয় তখন মাত্র শব্দবিন্যাস-পদ্ধতির সৌষ্ঠব বিধানই ইহাদের স্বরূপ। আমরা বামনের মূলকথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াই ইহাদের পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিতেছি।

'গাঢ়-বন্ধত্বম্ ওজঃ।'
'বন্ধের গাঢ়ত্বের নাম ওজঃ।'

এখানে রচনার গাঢ়ত্ব বলিতে জমকাল ধরণের শব্দবিন্যাসই বুঝিতে হইবে। কিন্তু প্রসাদগুণের কথা বলিতে গিয়া বামন লিখিয়াছেন,—

'শৈথিল্যং প্রসাদঃ।'
'রচনার শিথিলতার নাম প্রসাদগুণ।'

এখন, শব্দবিন্যাসের গাঢ়ত্ব যদি গুণ হয়, তবে তাহার শিথিলতা দোষই হইয়া পড়ে। তাই বামনকে বলিতে হইয়াছে, কেবল শৈথিল্য গুণ হইতে পারে না, তাহা দোষই। তাহাকে গুণ হইতে

হইলে গাঢ়ত্বের সহিত মিশ্রিত হইতে হইবে। সুতরাং প্রসাদগুণ ওজোমিশ্রিত হইলেই গুণ, অন্যথা সেটি দোষের মধ্যে গণ্য হইবে।

শ্লেষ নামক শব্দগুণের স্বরূপ সম্পর্কে বামন লিখিয়াছেন,—

'মসৃণত্বং শ্লেষঃ।'

'মসৃণত্বং নাম যস্মিন্ সতি বহূন্যপি
পদানি একবদ্ ভাসন্তে।'

—'মসৃণত্বই শ্লেষ।'

'মসৃণত্ব তাহাকেই বলিতে হইবে, যাহা থাকিলে অনেকগুলি পদও একটি বলিয়া মনে হয়।'

ইহার উদাহরণস্বরূপ লেখক কুমার-সম্ভবের প্রথম দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।'

—'উত্তরদিকে দেবতাস্বরূপ হিমালয় নামক পর্ব্বতাধিপতি আছেন।'

উদাহরণটি দেখিয়া মনে হয়, লেখক মসৃণতা অর্থে শব্দবিন্যাসের সেই ধর্মটিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যাহার প্রভাবে শব্দশ্রুতি একান্ত সাবলীল ও স্বচ্ছ হয় এবং উচ্চারণ-ক্রিয়া কোথাও ব্যাহত হয় না।

'মার্গাভেদঃ সমতা।'

'মার্গের অভেদের নাম সমতা।'

'যেন মার্গেণ উপক্রমস্তস্য অত্যাগ ইত্যর্থঃ।'

—'যে মার্গে আরম্ভ করা হইয়াছে তাহাকে ত্যাগ না করা—ইহাই অর্থ।'

এখানে লেখক বলিতে চাহিয়াছেন যে, কঠোর বা কোমল যেরূপ বর্ণবিন্যাস দ্বারা রচনা আরম্ভ করা হইবে আগাগোড়া যেন সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তাহা হইলে তাদৃশ রচনা সমতাগুণবিশিষ্ট হইবে।

'আরোহাবরোহ-ক্রমঃ সমাধিঃ।'

'আরোহ এবং অবরোহের ক্রমই সমাধি।'

রচনার সমাধি নামক শব্দগুণ তখনই আছে বলিতে হইবে, যখন উহার শব্দশ্রুতির ওঠানামার একটা নির্দ্দিষ্ট ক্রম থাকে। বস্তুতঃ 'মসৃণত্বং শ্লেষঃ'—শ্লেষের এই লক্ষণ করার পর, সমতা ও সমাধি নামক আরও দুইটি শব্দগুণের উল্লেখের বিশেষ অবকাশ ছিল না। এই দুইটি গুণ পূর্ব্বোক্ত শ্লেষের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত।

মাধুর্য্যনামক শব্দগুণের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বামন লিখিয়াছেন,—

'পৃথক্-পদত্বং মাধুর্য্যম্।'

'সমাস-দৈর্ঘ্য-নিবৃত্তি-পরং-চৈতৎ।'

—'পৃথক্ পদত্বের নাম মাধুর্য্য।'

'ইহা দীর্ঘ সমাসের নিবৃত্তিকে বুঝাইতেছে।'

রচনার মধ্যে যদি দীর্ঘ সমাস না থাকে তাহা হইলে উহা মাধুর্য্য-যুক্ত হয়। রচনাকে এই শব্দগুণ-বিশিষ্ট করিতে হইলে উহাকে অসমাস অথবা অল্পসমাস করিতে হইবে।

'অজরঠত্বং সৌকুমার্য্যম্।'

জরঠ শব্দের অর্থ পরুষ অথবা কর্কশ। রচনার মধ্যে কর্কশ বর্ণের আধিক্য থাকিলে তাহা শ্রুতির পীড়াদায়ক হইয়া পড়ে। তাদৃশ রচনা সুকুমার হয় না। এই শব্দগুণটিও শ্লেষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত।

"বিকটত্বম্ উদারতা।"

'যস্মিন্ সতি নৃত্যন্তীব পদানীতি—
জনস্য বর্ণনা ভবতি তদ্ বিকটত্বম্।'

—'বিকটত্বের নাম উদারতা।'

"যাহা থাকিলে 'পদগুলি যেন নৃত্য করিতেছে'—লোকে এইরূপ বলে তাহা বিকটত্ব।"

এখানে লেখক শব্দের স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল গতিভঙ্গীকে উদারতা কথাটির দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

'অর্থ-ব্যক্তিহেতুত্বম্ অর্থব্যক্তিঃ'।

যেরূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই অর্থ প্রতীতি হইতে পারে রচনার মধ্যে যদি সেইরূপ শব্দপ্রয়োগ থাকে তাহা হইলে তাদৃশ রচনার অর্থব্যক্তি নামক শব্দগুণ আছে বলিতে হইবে। শব্দগুলি যদি প্রাঞ্জল ও পরিচিত হয় তাহা হইলে সেগুলি হইতে অর্থের প্রতীতিও সহজ ও দ্রুত হইয়া থাকে। অন্যথা কাব্যপাঠের পরও অর্থজ্ঞান বিলম্বিত হইতে পারে। তাই ইহাকে শব্দগুণ বলা হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে কান্তি নামক শব্দগুণের উল্লেখ করা হইয়াছে,—

'ঔজ্জ্বল্যং কান্তিঃ।'

'যদভাবে পুরাণচ্ছায়েত্যুচ্যতে।'

—'উজ্জ্বলতার নাম কান্তি।'

'যাহা না থাকিলে রচনাকে পুরাতনের অনুকরণ বলিয়া বলা হয়।'

পুরাতন এবং নিতান্ত পরিচিত কথাও যদি শব্দবৈচিত্র্যে সজ্জিত হইয়া নিবেদিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে নূতন বলিয়া মনে হয়। শব্দ-গ্রন্থনের পারিপাট্যই সেখানে রচনার উজ্জ্বলতা বা কান্তি বিধান করে। বহুকালের পুরাতন একখানি মলিন ছবিতে নূতন করিয়া রং দিলে যেমন তাহা অপূর্ব্ব কান্তি ও উজ্জ্বলতা ধারণ করে, কাব্যকলার পক্ষেও ঠিক একই কথা খাটে—ইহাই লেখকের অভিপ্রায়।

এখন আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে,—বামন কথিত এই দশটি শব্দগুণ কাব্যাত্মার কতটুকু পরিচয় আমাদের দেয়? কোন রচনার বর্ণগুলি কঠোর কি কোমল, পদগুলি সমাস-বদ্ধ কি অসমস্ত, শব্দবিন্যাস জমকাল কি শিথিল—এগুলিকে মানদণ্ড ধরিয়া যাঁহারা কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা কাব্যদর্শনে একান্তই দেহাত্মবাদী। মাত্র শব্দবিন্যাসের চাতুর্য্য যে কাব্যকলার অত্যন্ত বহিরঙ্গ উপাদান—একথা প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তি-তর্কের খুব বেশী প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না কোন ব্যক্তির রং ফরসা কি কালো, তাহার কণ্ঠস্বর সরু

কি মোটা, তাঁহার আকৃতি হ্রস্ব কি দীর্ঘ—এসবের উপর যেমন তাঁহার স্বরূপ নির্ভর করে না, তেমনি কাব্যের কাব্যত্বও পূর্ব্বোক্ত শব্দগুণগুলির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল নহে। জীবের স্বরূপ যেমন শরীরাতিরেকী, কাব্যের স্বরূপও তেমনি উহার শব্দসৌষ্ঠবের অতিরিক্ত কোন বস্তু। সুতরাং শব্দগুণকে কাব্যের আত্মা বলা যায় না।

এইবার অর্থগুণগুলির স্বরূপ বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত ওজঃ প্রভৃতি সমস্ত গুণগুলিই যখন অর্থাশ্রিত হয়, তখন তাহারা অর্থগুণ। বামনের কথা হইতেই আমরা জানি,—

'অর্থস্য প্রৌঢ়িরোজঃ।'

—'অর্থের প্রৌঢ়তার নাম ওজঃ।'

লেখক এ স্থলে অর্থের প্রৌঢ়তা বলিতে অর্থগৌরবই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। এ সম্পর্কে তিনি পূর্ব্বাচার্য্যগণের একটি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

'পদার্থে বাক্যরচনম্

বাক্যার্থে চ পদাভিধা।

প্রৌঢ়িঃ.............

..................॥'

—'পদের অর্থে যদি বাক্যের প্রয়োগ করা হয় এবং বাক্যের অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে যদি পদ প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে অর্থের প্রৌঢ়ত্ব হইয়া থাকে।'

যেমন 'চন্দ্র' এই কথাটি না বলিয়া যদি 'অত্রি ঋষির নয়নসমুত্থিত জ্যোতিঃ' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে অর্থের প্রৌঢ়ত্ব পাওয়া যাইবে। তেমনি, 'এই রমণী দেবী নহেন, ইনি মানুষী'—এইরূপ বাক্য না বলিয়া যদি 'ইহার নিমেষ আছে'—এইরূপ সংক্ষিপ্ত প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে অর্থের প্রৌঢ়ি বা গৌরব হইল বুঝিতে হইবে। সুতরাং অর্থ-গাম্ভীর্য্যই প্রৌঢ়ির লক্ষণ।

'অর্থ-বৈমল্যং প্রসাদঃ।'

—'অর্থের বিমলতার নাম প্রসাদগুণ।'

বৈমল্য কথাটির ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে—'প্রয়োজক-মাত্র-পরিগ্রহঃ'—অর্থাৎ অভিপ্রেত অর্থবোধের জন্য যতখানি প্রয়োজন কেবল ততখানি শব্দ গ্রহণ করা। সুতরাং ব্যর্থবিশেষণের প্রয়োগে অর্থ-বৈমল্য ব্যাহত হইবে। তাদৃশ অর্থের প্রসাদগুণ থাকিবে না।

'ঘটনা শ্লেষঃ।'

কাব্যবর্ণিত বিবিধ ঘটনাবলীর সুসংহত প্রকাশের নাম শ্লেষ। অর্থের এই গুণটি বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে এমন ভাবে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া দেয় যে, সেগুলির আর পৃথক্‌সত্তা অনুভূত হয় না। তখন বহু খণ্ড মিলিয়া একটি সমগ্রের সৃষ্টি করিতে পারে।

'অবৈষম্যং সমতা।'

অর্থের যেখানে অবৈষম্য অর্থাৎ সুগমত্ব আছে, সেখানে সমতা নামক অর্থগুণ আছে বুঝিতে হইবে। এই গুণের প্রভাবে রচনাটি সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল হয়।

'অর্থদৃষ্টিঃ সমাধিঃ।'

রচনার যে গুণ থাকিলে পাঠকের চিত্ত অর্থদর্শনে সমাহিত হয় তাহার নাম সমাধি। কবিকর্ম্মের মধ্যে যদি এমন গুণ থাকে যে, তাহা কাব্যার্থবোধে পাঠকের চিত্তকে সমাহিত করিতে পারে, তবে তাহাতে সমাধি নামক অর্থগুণ আছে বুঝিতে হইবে। এই গুণটির প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া লেখক বলেন নাই।

'উক্তি-বৈচিত্র্যং মাধুর্য্যম।'

—'বাক্যের বৈচিত্র্যই মাধুর্য্য।'

কবিকর্ম্মের এই বৈচিত্র্যের হেতু এবং স্বরূপ সম্পর্কে বামন কোন আলোকসম্পাত করেন নাই। কাব্য বিচিত্র বলিয়া সুন্দর—এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইলে কাব্যাত্মার পরিচয় অপ্রকাশিতই থাকিয়া গেল। কাব্যজিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তির জন্য কাব্য কেন বিচিত্র, এই প্রশ্নের সমাধান আবশ্যক।

'অপারুষ্যং সৌকুমার্য্যম্।'

—'রূঢ়তার অভাবের নাম সৌকুমার্য্য।'

যাহা অপ্রীতিকর এবং বেদনাদায়ক সেইরূপ অর্থ বুঝাইতে যদি কোমলতর শব্দের ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে তাদৃশ শব্দের দ্বারা নিবেদিত অর্থের পীড়াদায়কত্ব থাকে না। 'তিনি মারা গিয়াছেন' না বলিয়া সেই অর্থটি প্রকাশের জন্য 'তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন' অথবা 'তিনি চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন'—ইত্যাদি বাক্যও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই পরবর্ত্তী বাক্যগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে ইহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সুকুমার এবং শোভন। সুতরাং ঈদৃশ অর্থের সৌকুমার্য্যগুণ আছে বুঝিতে হইবে।'

'অগ্রাম্যত্ব-মুদারতা।'

—'অগ্রাম্যত্বের নাম উদারতা।'

গ্রাম্য শব্দের অশ্লীল বা অসভ্য—এইরূপ অর্থ ধরিতে হইবে। রচনার মধ্যে যদি অশ্লীলার্থ না থাকে তাহা হইলে তাহা উপাদেয় ও রুচিকর হয়। তাদৃশ রচনার উদারতা নামক অর্থগুণ আছে বলিতে হইবে। বস্তুতঃ এই গুণটি একটি দোষের অভাব মাত্র।

'বস্তু-স্বভাবস্ফুটত্বম্ অর্থব্যক্তিঃ।'

—'বস্তু-স্বভাবের স্ফুটতার নাম অর্থব্যক্তি।'

যে বস্তুটি বর্ণনীয় যদি তাহার স্বভাবের যথাযথ বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলে রচনা অর্থব্যক্তি নামক অর্থগুণকে প্রাপ্ত হয়। বামনের এই অর্থগুণটি আলঙ্কারিকদের স্বভাবোক্তি নামক অলঙ্কারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার উদাহরণগুলিও সেই ভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে কান্তিগুণের লক্ষণ নির্ণয় করিতে গিয়া বামন বলিয়াছেন,

'দীপ্ত-রসত্বং কান্তিঃ।'

যে অর্থগুলির মধ্যে শৃঙ্গার প্রভৃতি রস দীপ্তভাবে প্রকাশিত হয় তাহাতে কান্তিগুণ আছে বুঝিতে হইবে। ইহার উদাহরণস্বরূপ

বামন যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও শৃঙ্গাররসেরই উদাহরণ। রসের আলোচনা আমরা যথাস্থানে করিব। এ স্থলে এইটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বামন কাব্যের স্বরূপ জিজ্ঞাসায় রসগুলিকে অত্যন্ত গৌণ স্থানই দিয়াছেন। বহুগুণের মধ্যে রসবত্তাও একটি গুণ—ইহাই তাঁহার অভিমত। ইহা না থাকিলে কাব্যাত্মার যে কোন হানি হয় তাহা তিনি মনে করিতেন না। তাছাড়া রসের রসত্ব কোথায়—ইহা তিনি প্রকাশ করেন নাই।

'রীতি কাব্যের আত্মা'—এই কথা বলিয়া বামন তিনটি রীতির নাম করিয়াছেন—বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী। এইগুলির লক্ষণ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—বৈদর্ভী রীতিকে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুণগুলি থাকে; গৌড়ী রীতিতে ওজঃ এবং কান্তিগুণ থাকে; পাঞ্চালী রীতি মাধুর্য্য এবং সৌকুমার্য্য গুণসম্পন্ন হয়। এখানে দেখা যাইতেছে, পাঞ্চালী রীতির মধ্যে দীপ্তরসত্ব বা কান্তিগুণ থাকার আবশ্যকতা নাই। সুতরাং কাব্যতত্ত্ব-নির্ণয়ে রসের অপরিহার্য্যতা বামন স্বীকার করিতেন না।

বামনকথিত পূর্ব্বোক্ত অর্থগুণগুলির স্বরূপ নিপুণভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, যদিও এগুলি শব্দগুণ অথবা অলঙ্কার অপেক্ষা অন্তরঙ্গতর, তথাপি এইগুলিকেই কাব্যের আত্মা বলা যায় না। এই অর্থগুণগুলির কয়েকটিকে গুণ না বলিয়া দোষের অভাব মাত্র বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ উদারতা নামক অর্থগুণটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রাম্যতার অভাবকেই অর্থের উদারতা বলা হইয়াছে। গ্রাম্যতা বা অশ্লীলতা রচনার একটি বিশিষ্ট দোষ সত্য। কিন্তু সেইটির অভাবকেই যদি গুণ বলিয়া ধরিতে হয়—তাহা হইলে যে ব্যক্তির খঞ্জতা বা বধিরতার অভাব আছে, তাহার সেই সেই দোষাভাবগুলিও গুণরূপে গণ্য হইয়া পড়ে; যিনি পায়ে হাঁটিতে পারেন অথবা কাণে শুনিতে পান তাঁহাকে বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তি বলিতে হয়।

বস্তুতঃ বামনকথিত প্রসাদ, সমতা, সৌকুমার্য্য ও শ্লেষ, এই

গুণগুলি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দোষের অভাব মাত্র। রচনার মধ্যে নিরর্থক বা অবান্তর পদের প্রয়োগ না থাকিলে অর্থ বৈমল্য রূপ প্রসাদগুণ হয়; অর্থটি দুর্ব্বোধ্য না হইলে অথবা অর্থ-প্রয়োগের ক্রমভঙ্গ না হইলে অবৈষম্যরূপ সমতাগুণ হয়; বেদনাদায়ক বা অপ্রীতিকর অর্থের প্রয়োগ না থাকিলে অপারুষ্যরূপ সৌকুমার্য্যগুণ হয়; এবং ঘটনাবলী শ্লথবিন্যস্ত না হইয়া যদি ঘনসন্নিবদ্ধ হয় তবে শ্লেষ নামক অর্থগুণ পাওয়া যায়। এগুলিকে সেই সেই দোষের অভাব না বলিয়া গুণ বলা কতখানি সমীচীন তাহা সুধীগণই বিচার করিয়া দেখিবেন।

বামনের অর্থ-প্রৌঢ়ত্বরূপ ওজোগুণ অর্থের একটি বিশিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গী ছাড়া আর কিছুই নহে। চন্দ্রকে 'চন্দ্র' না বলিয়া অত্রি-ঋষির নয়ন-সমুত্থিত জ্যোতিঃ—এইরূপ বলিলে অর্থপ্রকাশের একটা অভিনব প্রকার পাওয়া যায় মাত্র; তদতিবিক্ত কিছু ইহার মধ্যে আমরা পাই না। তাই পরবর্ত্তীকালে মম্মট তাঁহার কাব্যপ্রকাশের মধ্যে এটিকে গুণ বলিয়া স্বীকারই করেন নাই। মম্মটের উক্তিটি এইরূপ;—

'যা প্রৌঢ়িঃ ওজ ইত্যুক্তং তদ্ বৈচিত্র্যমাত্রং, ন গুণঃ।
তদভাবেহপি কাব্যব্যবহার-প্রবৃত্তেঃ॥'

—'যে প্রৌঢ়িকে ওজঃ বলিয়া বলা হইয়াছে তাহা বৈচিত্র্যমাত্র; গুণ নহে। কারণ তাহার অভাবেও কাব্যব্যবহার দেখা যায়।'

অর্থদৃষ্টি বা অর্থের দর্শনরূপ যে সমাধিগুণের কথা বামন বলিয়াছেন, সেটিকেও গুণ মনে করিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই। কারণ, শব্দার্থযোগেই কাব্যশরীর গঠিত; অর্থকে বাদ দিয়া কাব্য-গঠনের কথা ভাবা যায় না। সুতরাং সেই অর্থদর্শনকে আবার একটি গুণ বলিয়া উল্লেখ করার বিশেষ যৌক্তিকতা নাই। যাহা শরীরমাত্র তাহাকে কেমন করিয়া গুণ বলা যাইতে পারে? কোন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তাহার গুণ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। আর যদি সমাধি কথাটির এমন অর্থ করা যায় যে,—'রচনার যে গুণ থাকিলে পাঠকের চিত্ত অর্থদর্শনে সমাহিত হয় তাহাই সমাধি'—

তাহা হইলে সেই গুণটির যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করা আবশ্যক। অন্যথা এই গুণটির উল্লেখ অবান্তর হইয়া পড়ে।

বামনের অর্থব্যক্তি নামক অর্থগুণের স্বরূপ হইতেছে বস্তু-স্বভাবের স্ফুটতা। যে বস্তুর ঠিক যেমনটি স্বভাব তাহা স্ফুটভাবে বর্ণিত হইলে এই গুণটি পাওয়া যায়। আমরা ইতিপূর্ব্বেই অর্থব্যক্তির স্বরূপ বিচারকালে বলিয়াছি যে অলঙ্কারবাদিগণ এটিকে অর্থের গুণ না বলিয়া স্বভাবোক্তিনামক অলংকারই বলিয়াছেন।

মাধুর্য্যগুণের লক্ষণ করিতে গিয়া বামন বলিয়াছেন যে, উক্তির বৈচিত্র্যই মাধুর্য্য। বলাবাহুল্য, এই লক্ষণটি অত্যন্ত অস্পষ্ট। উক্তির বৈচিত্র্য বলিতে আমরা কি বুঝিব? যদি উক্তি অর্থে বাক্য ধরা যায় তাহা হইলে কথাটির মানে দাঁড়ায় বাক্যের বিশিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গী ও তখন ইহা একটি শব্দধর্ম হইয়া পড়ে। আর, উক্তি অর্থে যদি বাচ্য অর্থটিকে ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার বৈচিত্র্যের স্বরূপ কি তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। কাব্য বিচিত্র বলিয়া মধুর—এইরূপ একটি উক্তির দ্বারা কাব্যতত্ত্ব অনভিব্যক্তই থাকিয়া যায়। সাহিত্য-সমালোচককে সেই বৈচিত্র্যের হেতুটি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে।

সর্ব্বশেষে বামন তাঁহার কান্তিগুণের প্রসঙ্গে রসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কান্তিগুণের আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি যে, বামনের মতে রসবত্তা কাব্যের অন্যতম গুণ হইলেও তাহাই কাব্যের আত্মা বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। সেইজন্য রীতিবাদের মধ্যে রসের স্থান অত্যন্ত গৌণ। এইভাবে রসের স্বীকৃতি ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি অলংকারবাদীদের গ্রন্থেও পাওয়া যায়। তাঁহারা রসকে কাব্যের একটি অলংকাররূপেই দেখিয়াছেন এবং তাহার নাম দিয়াছেন রসবৎ-অলঙ্কার।

সুতরাং দেখা গেল, বামনের তথাকথিত অর্থগুণগুলিও কাব্যতত্ত্ব-নির্ণয়ে আমাদের খুব সহায়ক নহে। এগুলির দ্বারা প্রধানতঃ তিনি অর্থ-প্রকাশের ভঙ্গীটির উপরই জোর দিয়াছেন—কিন্তু প্রকাশমান

অর্থটির স্বরূপ বিচারে উল্লেখযোগ্য আলোকপাত করেন নাই। গুণতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনায় সর্ব্বশক্তি ব্যয়িত করিয়া গুণীর দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ তাঁহার হয় নাই। অলঙ্কারবাদে যেমন অলংকারের কোলাহলে অলংকার্য্য চাপা পড়িয়াছে, রীতিবাদে তেমনি গুণের অন্তরালে গুণী অপ্রকাশিতই থাকিয়া গিয়াছে। অলংকারবাদীরা কাব্যপুরুষের মণি-মাণিক্য-খচিত মুকুট দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন; আর রীতিবাদীরা দেখিয়াছিলেন তাঁহার সুললিত, সুঠাম অবয়বসংস্থান। ফলে কাব্যাত্মার যথার্থ স্বরূপটি ইহাদের নিকট অজ্ঞাতই থাকিয়া গিয়াছে।

ইহাদের এই বাদানুবাদে কাব্যের সেই অন্তর্যামী সত্তা হাসিয়া-ছিলেন কিনা জানি না। তবে এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'কণিকার' একটি কবিতা আমাদের মনে পড়ে,—

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহাধুমধাম—
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্ত্তি ভাবে 'আমি দেব', হাসে অন্তর্যামী॥

বস্তুতঃ, বামন যদিও 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' বলিয়া প্রথমেই কাব্যের আত্ম-তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পরবর্ত্তী উক্তিগুলি এই প্রতিজ্ঞার পোষক নহে। তিনি কাব্যের তিনটি রীতির নাম করিয়া তৎসম্বন্ধে মন্তব্য করিতেছেন,—

'এতাসু তিসৃষু রীতিষু
রেখাস্বিব চিত্রং কাব্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি।'

—'যেমন রেখাতে চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি এই তিনটি রীতিতে কাব্য প্রতিষ্ঠিত থাকে।'

গুণগুলির আলোচনার কালে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,—

'যথা হি ভিত্তৌ রেখা
চতুরং চিত্র-পণ্ডিতৈঃ।

তথৈব বাগপি প্রাজ্ঞৈঃ
সমস্ত-গুণ-গুম্ফিতা ॥'

—'নিপুণ চিত্রকর যেমন চাতুর্য্যের সহিত রেখার বিন্যাস করেন, ঠিক তেমনি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বাক্যও সমস্ত গুণে গ্রথিত হইয়া বিন্যস্ত হয়।'

বামনের নিজের উক্তি হইতেই দেখা যাইতেছে যে, তিনি কাব্যের গুণকে চিত্রের রেখার সহিত তুলনা করিয়াছেন। রেখার সন্নিবেশে যেমন চিত্র রূপ গ্রহণ করে,—রীতি ও গুণের সন্নিবেশেও তেমনি কাব্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, রেখাগুলি চিত্রের প্রকাশের জন্য যতই প্রয়োজনীয় হউক—সেইগুলিই চিত্রের আত্মা নহে। চিত্রের আত্মা হইতেছে সেই বস্তু যাহা চিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। তাহা আর যাহাই হউক না কেন, রেখাপুঞ্জ মাত্র নহে—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রতিমার মৃন্ময়রূপের অন্তরালে চিন্ময় সত্তার উপলব্ধিই প্রকৃত দর্শন। যথার্থ দ্রষ্টার নিকট চিত্র বা প্রতিমার ভূষণ, অবয়ব-সংস্থান বা তুলির টানগুলি অবান্তর। কাব্যের সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা। ইহার রীতি, গুণ বা অলংকার কাব্যতত্ত্বদর্শীর নিকট ততটা প্রয়োজনীয় নহে। যাহাকে আশ্রয় করিয়া এগুলি বর্ত্তমান থাকে তাহার স্বরূপতত্ত্বটি যতক্ষণ না যথাযথভাবে নির্ণীত হইতেছে ততক্ষণ জিজ্ঞাসার বিরতি হইতে পারে না।

সেই তত্ত্বটি কি? পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১১	ষম্মট	মম্মট
৬	৮	যথার্থ	যাথার্থ্য
৭	১৩	অবশ্যই আছে রচনাকে	অবশ্যই আছে, যাহা রচনাকে
৭	১৫	পরবর্ত্তী অধ্যায় যাহা গুলিতে	পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে
২৬	২৩	আমরা জানি-শব্দ প্রয়োগের	আমরা জানি, শব্দ-প্রয়োগের
৩২	২৬	পরাক্রমাতিশর্য্য	পরাক্রমাতিশয্য
৩৬	১১	মুখ্যাথগুলির	মুখ্যার্থগুলির
৩৭	৭	কুসুমসময়যুগম্, উপসংহরন্	কুসুমসময়যুগম্ উপসংহরন্
৩৮	৪	ব্যঙ্গ্যাথটি	ব্যঙ্গ্যার্থটি
৪০	১৪	শব্দশ্লেষে	শব্দশ্লেষ
৪৫	১৪	বাকান্তর্গত	বাক্যান্তর্গত।
৬০	১৫	নিম্নোর্দ্ধত	নিম্নোদ্ধৃত
৬১	২২	আলবঙ্কারিক	আলঙ্কারিক
৬৩	২৪	অনঙ্কৃত	অনলঙ্কৃত

Acc. No. 4020
Date 6/4/15
Call No 891.44103/SAR